জরুরতুল ইমাম

ইমামের আবশ্যকতা

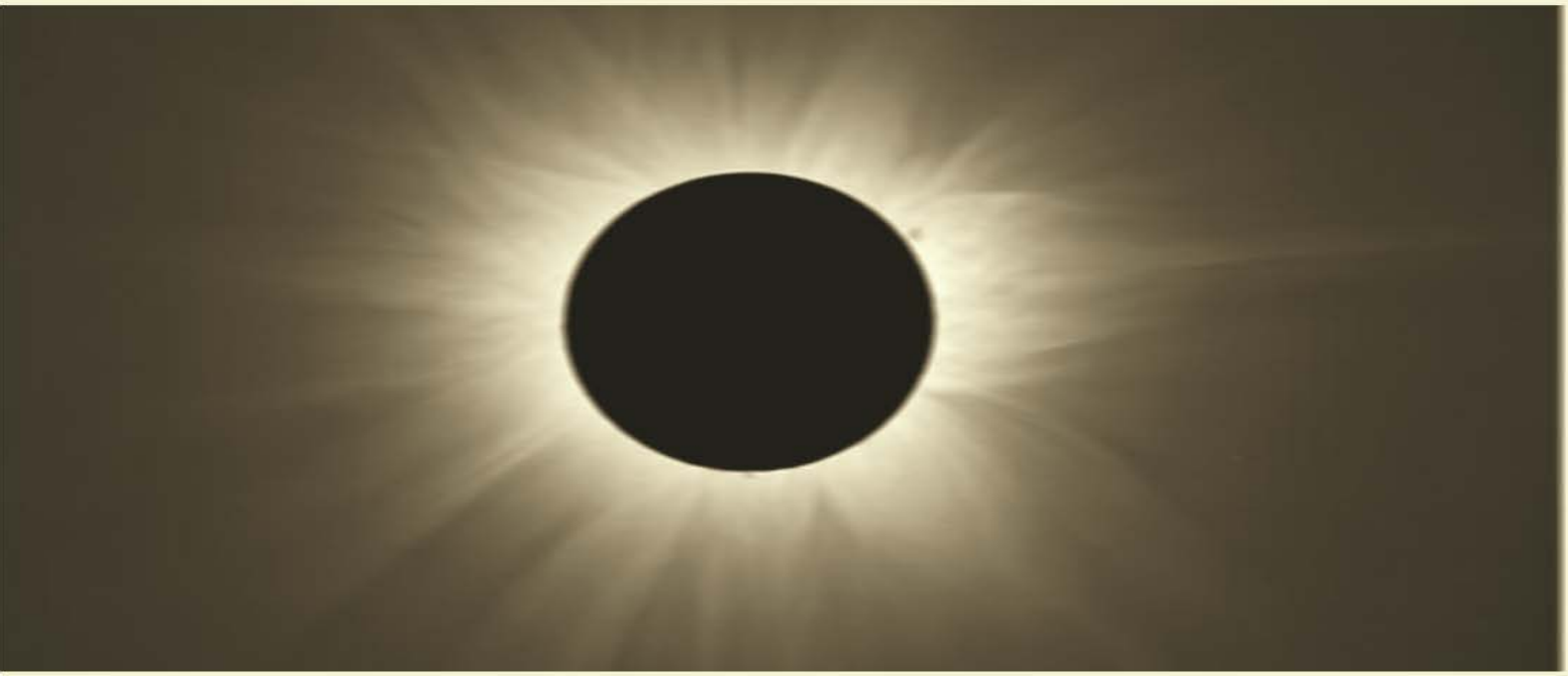

লেখক

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

জরুরতুল ইমাম
(ইমামের আবশ্যকতা)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

জরুরতুল ইমাম

লেখকের নাম	ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)
বঙ্গানুবাদ	ঃ	মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব
সংস্করণ	ঃ	ডিসেম্বর, ২০২১ (ভারত)
সম্পাদনায়	ঃ	বাংলা ডেস্ক, ভারত
সংখ্যা	ঃ	৫০০
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত,সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পাঞ্জাব
মূদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস,কাদিয়ান, গুরদাসপুর,পাঞ্জাব

Title	:	Zarurat-ul-Imam
Author	:	Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad The Promised Messiah & Mahdi[as]
Translator	:	Molvi Mohammad Saheb
Edition	:	December, 2021 Bengali
Review & Edited by	:	Bangla Desk, India
Copies	:	500
Published by	:	Nazarat Nashr-o-Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab
Printed at	:	Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

মুসলিম উম্মতের যাবতীয় উন্নতি জাগতিক কিংবা আধ্যাত্মিক সবই যুগ ইমামের সঙ্গে একাত্মতার উপর নির্ভরশীল। খোদাতালার অঙ্গীকার এবং নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালামকে মসীহ্ মওউদ এবং ইমাম মাহদী এবং এই যুগের ইমাম করে প্রেরণ করেছেন।

তিনি (আ.) ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে এই দাবী করেন যে আঁ হযরত (সা.) -এর দাসত্ব এবং অনুবর্তিতায় আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইমাম মাহ্দী রূপে প্রেরণ করা হয়েছে। হিজরী চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমানদের উপর খুবই শোচনীয় অবস্থা বিরাজমান ছিল। তারা কেবল নামমাত্র মুসলমান রয়ে গিয়েছিল। তাদের ঈমান এবং আমলের দুর্বলতাকে প্রত্যক্ষ করে খ্রিস্টান এবং অপরাপর জাতিগুলি চারদিক হতে ইসলামের উপর আক্রমণ শানিয়ে চলেছিল। অপরদিকে সমসাময়িক পরিস্থিতি স্বয়ং কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছিল যে ইসলামের সমর্থনে কেউ যেন অবশ্যই আগমন করে এবং শত্রুশক্তিকে বিনাশ করে ইসলাম ধর্মকে এক নবজীবন দান করে। উম্মতে মুহম্মাদীয়ার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পারিক মতভেদকে দূর করে পুনরায় তাদেরকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলে পৌঁছে যাওয়া ঈমানকে পুনরায় যেন ধরাপৃষ্ঠে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এহেন পরিস্থিতিতে হযরত মসীহ্ মওউদ আলায়হেস্ সালামকে আল্লাহ্তালা উম্মতের সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি (আ.) সমস্ত জগৎ সংসারকে ইসলাম,মুহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং কুরআন করীম-এর পতাকাতলে একত্রিত করা তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা মুসলিম উম্মতকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং যুগের ইমামকে শনাক্ত করে তাঁর বয়াত গ্রহণের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক

কল্যাণরাজি এবং আশিসপ্রাপ্ত হয়ে ওঠার তৌফিক দান করুন। আমিন।

পুস্তক **'জরুরতুল ইমাম'** (ইমামের আবশ্যকতা) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)- ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে তিনি যুগের ইমামের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর লক্ষণাবলীগুলি কি কি, সেইসাথে অপরাপর ঐশী বাণীপ্রাপ্ত, স্বপ্নদ্রষ্টা এবং দিব্য-দর্শনকারীগণের উপর তাঁর কি কি প্রাধান্য ও বিশেষত্ব রয়েছে সেগুলি বিশদে তুলে ধরেছেন।

পুস্তকটির প্রথম বাংলা সংস্করণ ১৯৫২ সনে **'জরুরতুল ইমাম বা ইমামের আবশ্যকতা'** শিরোনামে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকখানা বাংলায় অনুবাদ করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব।

পুস্তকটির পুনঃপ্রকাশে নতুনভাবে কম্পোজ করেছেন মোকাররমা বুশরা হামিদ সাহেবা এবং আরবী সহ সম্পূর্ণরূপে পুস্তকটির সেটিং ও মূল উর্দূ পুস্তকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্য বাংলা ডেস্ক কাদিয়ান। পুস্তকটির রিভিউ করেছেন জনাব আবু তাহের মন্ডল সদর রিভিউ কমিটি বাংলা এবং প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন জনাব হুমায়ুন কবীর ভরতপুর এবং মোহতরমা সাজিদা খাতুন সাহেবা।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর অনুমোদনে পুস্তকটির বাংলা সংস্করণ কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হচ্ছে।

আল্লাহ্তা'লা আমাদের সবাইকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই পুস্তক হতে যথোচিত লাভবান হওয়ার সামর্থ্য প্রদান করুন এবং বিশ্ববাসীকে যুগের ইমামকে শনাক্ত করার এবং তাঁকে মান্য করার মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এ শামিল হওয়ার সৌভাগ্য প্রদান করুন। আমিন।

ডিসেম্বর ২০২১ **হাফিয মখদুম শরীফ**

নাযির নশর ও এশায়া'ত কাদিয়ান

লেখক পরিচিতি

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম,

[জন্ম ঃ ১২৫০ হিঃ, ১৮৩৫ খৃ. মৃত্যু ঃ ১৩২৬ হিঃ, ১৯০৮ খৃ.]

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে

সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০ টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-এর ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষনা করার আদেশ প্রদান করেন যে,তিনি তাঁকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবী করেন যে; তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহমদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর কুরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.) র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.)-র পঞ্চম খলীফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

ٹائیٹل بار اول

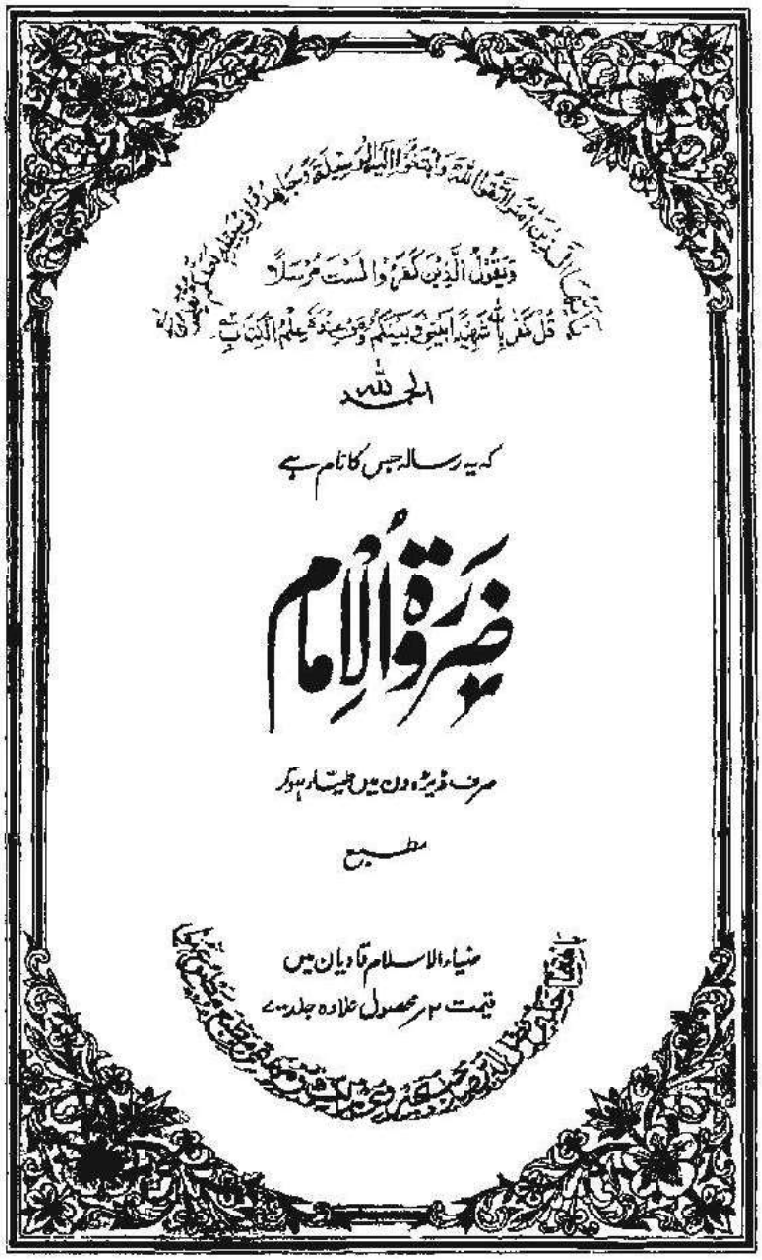

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ১৮৯৭

জরুরতুল ইমাম
বা
ইমামের আবশ্যকতা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى

অতঃপর প্রকাশ থাকে যে, ইহা সহীহ হাদীস* দ্বারা প্রমাণিত যে **ব্যক্তি যুগ-ইমামকে সনাক্ত করে না, তাহার জাহেলিয়ত বা অজ্ঞতার মৃত্যু হয়**। এই হাদীসটি একজন ধর্ম-ভীরু ব্যক্তির হৃদয়কে যুগ-ইমামের অনুসন্ধানে ধাবমান করিতে যথেষ্ট। কারণ জাহেলিয়াতের মৃত্যু এরূপ এক দুর্ভাগ্যের সমষ্টি যে, কোন প্রকারের অকল্যাণ এবং অমঙ্গলই ইহার গন্ডির বাহিরে নহে। অতএব, নবী (সাঃ)-এর এই ওসীয়্যত-বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক সত্যান্বেষীর প্রকৃত ইমামের অনুসন্ধানে তৎপর থাকা অত্যাবশ্যক।

যে কেহ সত্য-স্বপ্ন প্রাপ্ত হয় বা যাহার উপর ইলহাম বা ঐশী বাণীর দ্বার উন্মুক্ত হয়, সেই ব্যক্তিই এই নামে অভিহিত হইবার যোগ্য- ইহা সত্য নহে। পরন্তু ইমামের যথার্থতা আরও কতগুলি বিশেষ গুণরাজি ও চরম কামালিয়তের মধ্যে নিহিত, যাহার দরুন তিনি আকাশে ইমাম বলিয়া আখ্যায়িত। ইহাও সুস্পষ্ট যে, কেবল পরহেযগারী বা পবিত্র চিন্তার জন্যই কেহ ইমাম নামে অভিহিত হইতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেন-

---

* حدثنا عبدالله حدثنى أبى حدثنا اسود بن عامر انا أبو بكر عن عاصم عن أبى صالح عن معاوية۔ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بغير امام مات ميتة جاهلية۔ صفحه نمبر ۹۶ جلدنمبر ۴ مسند احمد و اخرجه احمد و الترمذى و ابن خزيمة و ابن حبان و صحّحه من حديث الحارث الاشعرى بلفظ من مات وليس عليه امام جماعة فان موتته موتة جاهلية۔ و رواه الحاكم من حديث بن عمرو من حديث معاوية و رواه البزّار من حديث ابن عباس۔

وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

(অর্থাৎ, "এবং আমাদিগকে মুত্তাকীগণের (ধর্ম-ভীরুগণের) জন্য ইমাম কর" (সূরা ফুরকান 25 ঃ 75)]। সুতরাং প্রত্যেক মুত্তাকী যদি ইমাম হন, তাহা হইলে সকল মু'মিন-মুত্তাকীই ইমাম হইবেন এবং ইহা উল্লিখিত আয়াতের মর্মবিরুদ্ধ। এইভাবে পবিত্র কুরআনের শিক্ষামতে প্রত্যেক মুলহাম বা প্রত্যাদেশ লাভকারী এবং সত্য-স্বপ্নদর্শী ইমাম হইতে পারেন না, কেননা সাধারণ বিশ্বাসীগণের জন্য কুরআন করীমে এই শুভসংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

[অর্থাৎ, "মু'মিনগণ ইহজীবনেই এই নেয়ামতের অধিকারী হইবেন। প্রায়শ: তাহারা সত্য-স্বপ্ন ও ইলহাম লাভ করিবেন।" (সূরা ইউনুস 10 ঃ 65)। পুনঃ কুরআন শরীফের অন্যত্র আছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا

অর্থাৎ, "যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং উহাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে ফিরিশতাগণ তাহাদিগকে সুসংবাদের প্রত্যাদেশ-বাণী (ইলহাম) শ্রবণ করাইতে এবং সান্ত্বনা দান করিতে থাকেন (সূরা হা মীম্ আস্ সাজ্‌দা 41 ঃ 31), যেরূপে হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতাকে ইলহামের দ্বারা সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কুরআন প্রকাশ করিতেছে যে, এই ধরনের ইলহাম বা সত্য-স্বপ্ন লাভ সাধারণ বিশ্বাসীগণের জন্য এক আধ্যাত্মিক পুরস্কারস্বরূপ- তা তিনি পুরুষই হউন বা স্ত্রীলোকই হউন। এইরূপ ইলহাম প্রাপ্তির দরুন তারা যুগ-ইমামের আনুগত্যের উর্ধ্বে হইতে পারে না। এই সকল ইলহামের অধিকাংশই তাহাদের ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কিত হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভ হয় না, ইহা দৃঢ়তার সাথে কোন মহৎ দাবীর যোগ্য নহে ও অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নহে, বরং কখনও কখনও এগুলি পদস্খলনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না ইমামের সাহায্য-সহায়তা জ্ঞানের বিকাশ ও বিস্তৃতি না ঘটায় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ক্রমেই বিপদ হইতে নিরাপদ হওয়া যায় না। ইহার সাক্ষ্য ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসেই রহিয়াছে। কেননা, এক ব্যক্তি যে কুরআন শরীফের কাতেব (শ্রুতি

লিখক) ছিল, নবুওয়তের আলোকের সান্নিধ্যে অবস্থান হেতু কোন কোন সময় এরূপও ঘটিয়াছে যে, ইমাম অর্থাৎ নবী (সাঃ) কোন আয়াত লিপিবদ্ধ করাইবার নিমিত্ত ঐ ব্যক্তির নিকট উচ্চারণ করিবার পূর্বেই উহা তাহারও অন্তরে উদ্রেক হইত। একদিন সে ভাবিল যে, "আমার এবং রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে প্রভেদ কী? আমার নিকটেও প্রত্যাদেশ-বাণী হয়।" এই ধারণার জন্যই সে ধ্বংস হইয়াছিল। লিখিত আছে যে, কবরও তাহাকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, যেভাবে (হযরত মূসা আঃ-কে অস্বীকার করার জন্য- প্রকাশক) বালআম বাউর বিনষ্ট হইয়াছিল। যদিও হযরত উমর রাযিআল্লাহুআনহুও ইলহাম লাভ করিতেন; কিন্তু তিনি নিজেকে নগণ্য জ্ঞান করিতেন এবং সত্য ইমামত (আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব) যাহা আকাশের খোদা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সমকক্ষ হইতে চাহেন নাই বরং তিনি নিজেকে এক নগণ্য চাকর ও ভৃত্য বলিয়া মনে করিতেন। সেই জন্য খোদার অনুগ্রহ তাঁহাকে প্রকৃত ইমামতের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলেন। উওয়েস কারনী (রাঃ)-এর উপরেও ইলহাম হইত। তিনি এইরূপ দীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, নবুওয়ত ও ইমামতের ভাস্করের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন। আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বহুবারই ইয়ামেনের দিকে মুখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

اَجِدُ رِيْحَ الرَّحْمٰنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ

অর্থাৎ "আমি ইয়ামেনের দিক হইতে খোদার সৌরভ পাইতেছি।" এই কথায় ইহাই ইঙ্গিত ছিল যে, উওয়েসের মধ্যে খোদার নূর অবতীর্ণ হইয়াছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বর্তমান যুগের অধিকাংশ মানুষ সত্য ইমামতের আবশ্যকতা বুঝে না। একটি সত্য-স্বপ্ন বা ইলহামের কয়েকটি বাক্য লাভ করিলেই মনে করে যে, তাহাদের আর যুগ-ইমামের প্রয়োজন নাই। তারা ভাবে, "আমরাই বা কোন অংশে কম?" তাহাদের মনে একথা উদিত হয় না যে, এরূপ ধারণা করাও মহাপাপ। কারণ আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক শতাব্দীতে যুগ-ইমামের প্রয়োজনীয়তাকে

প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন এবং পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি যুগ-ইমামকে গ্রহণ না করিয়া খোদাতাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে, সে অজ্ঞতার মৃত্যুবরণ করিবে এবং সে আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধ হইয়া খোদার নিকট উপস্থিত হইবে।

এই হাদীসে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, মুলহাম বা সত্য-স্বপ্নদ্রষ্টাগণের মধ্যে কোন তারতম্য করেন নাই যদ্দারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি- সে মুলহাম বা সত্য স্বপ্ন-দর্শীই হউক না কেন, যদি সে যুগ-ইমামের শিষ্যত্ব গ্রহণ না করে, তাহা হইলে তাহার পরিণাম ভীতিপূর্ণ হইবে; কেননা ইহা সুস্পষ্ট যে, এই হাদীসে সকল মু'মিন ও মুসলমানকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক যুগে সহস্র সহস্র সত্য-স্বপ্নদ্রষ্টা এবং মুলহামেরও আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সত্য কথা এই যে, মুহাম্মদী উম্মতে কোটি কোটি এরূপ ব্যক্তি থাকিতে পারেন যাহাদের উপর ইলহাম বা ঐশী-বাণী অবতীর্ণ হইয়া থাকিবে। তাহা ছাড়া হাদীস ও কুরআন হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, যুগ-ইমামের আবির্ভাবকালে যদি কাহারও সত্য-স্বপ্ন দর্শন বা ইলহাম লাভ ঘটে, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে উহা যুগ-ইমামের জ্যোতিরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র, যাহা যথোপযুক্ত হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়।

প্রকৃত কথা এই যে, যখন পৃথিবীতে যুগ-ইমামের আবির্ভাব হয়, তখন তাহার সঙ্গে সহস্র জ্যোতি-ধারা অবতীর্ণ হয় এবং আকাশে এক মহা আনন্দের হিল্লোল উঠে, যাহার ফলে আধ্যাত্মিকতা ও আলোকের স্ফুরণ ঘটে এবং পৃথিবীতে পবিত্র বৃত্তি নিচয় জাগ্রত হইয়া উঠে। তখন যাহার মধ্যে ইলহাম লাভের স্বাভাবিক বৃত্তি থাকে, তাহার জন্য ইলহামের ধারা শুরু হইয়া যায়। যে ব্যক্তি চিন্তা ও প্রগাঢ় মনোনিবেশের ফলে ধর্মোন্নতির বুৎপত্তি লাভের যোগ্যতা রাখে, তাহার চিন্তা-বোধ ও ধারণা-শক্তিকে বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং যাহার মধ্যে ইবাদতের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে, তাহাকে ইবাদত ও উপাসনার মধুর আস্বাদ প্রদান করা হয়। যে ব্যক্তি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণের সহিত তর্ক-বিতর্ক করে, তাহাকে দলীল নির্ণয় ও যুক্তি-প্রমাণের পূর্ণতা সাধনের শক্তি দান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত ব্যাপারই যুগ-ইমামের সঙ্গে আকাশ হইতে যে আধ্যাত্মিক জ্যোতিস্ফুরণ হয়, উহারই ফলশ্রুতি মাত্র, যাহা প্রত্যেক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। ইহা আল্লাহ্‌র

একটি সাধারণ বিধান ও নিয়ম যাহা আমরা মহিমান্বিত কুরআন ও সহীহ হাদীসের পথ প্রদর্শনে অবগত হই এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু মসীহ্ মওউদের যুগের জন্য ইহা অপেক্ষা আরো বড় বিশেষত্ব রহিয়াছে এবং তাহা এই যে, প্রাথমিক নবীগণের ধর্মগ্রন্থে এবং নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসসমূহে লিখিত আছে যে, মসীহ্ মওউদের আবির্ভাবের সময় এত অধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক জ্যোতির স্ফুরণ ঘটিবে যে, স্ত্রীলোকেরাও ইলহাম পাইতে আরম্ভ করিবে ও নাবালক শিশুরাও ভবিষ্যদ্বাণী করিবে এবং আপামর জনসাধারণও রূহুল কুদুসের (পবিত্র আত্মার) সাহায্যে কথা বলিবে। এসব কিছুই হইবে মসীহ্ মওউদের আধ্যাত্মিক জ্যোতির প্রতিচ্ছবিস্বরূপ। যেরূপ কোন দেওয়ালে সূর্য রশ্মি পতিত হইলে দেওয়াল উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এবং যদি চুন ও বার্নিশ দ্বারা সুন্দর করা হয় তাহা হইলে উহা আরও উজ্জ্বল হয়। আবার যদি উহার উপর কাঁচ বসানো হয়, তবে উহার আলো এরূপ বাড়িয়া যায় যে, তখন সে দিকে আর তাকানোও যায় না। কিন্তু দেওয়াল এই সকল গুণ নিজের বলিয়া দাবী করিতে পারে না। কেননা, সূর্যাস্তের পর ঐ আলোর লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না।

সুতরাং সমুদয় ইলহামী জ্যোতিই যুগ-ইমামের জ্যোতির প্রতিফলন মাত্র। যদি ভাগ্য বিরূপ না হয় এবং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন পরীক্ষা সমুপস্থিত না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক সরল-চিত্ত ব্যক্তিই এই তত্ত্বটি সহজেই বুঝিতে সক্ষম হইবেন। খোদা না করুন, যদি কেহ এই ঐশী তত্ত্বটি বুঝিতে না পারে এবং যুগ-ইমামের আবির্ভাবের সংবাদ শুনিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করে, তাহা হইলে প্রথমে সেই ব্যক্তি ইমামের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে, ঔদাসীন্য হইতে পরে তাহা বিচ্ছিন্নতা এবং বিচ্ছিন্নতা হইতে কু-ধারণা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অতঃপর কু-ধারণা হইতে শত্রুতার উদ্ভব হয়। খোদা রক্ষা করুন, এই শত্রুতা হইতে পরিশেষে ঈমান বিলুপ্তির পর্যায় গিয়া পৌঁছায়। যেমন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সময় সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী ইলহাম ও দিব্য-দর্শনের অধিকারী ছিল। কিন্তু যখন আবার তাহারাই যুগ ইমাম হযরত খাতামাল আম্বিয়া (সাঃ)-কে গ্রহণ করিল না, তখন খোদাতাআলার ক্রোধাগ্নি তাহাদিগকে ধ্বংস করিল এবং খোদার সহিত তাহাদের সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাহাদের সম্বন্ধে কুরআন

শরীফে যে সকল কথা বর্ণিত আছে, উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাহাদের সম্বন্ধেই কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ

এই আয়াতের অর্থ এই যে, এই সকল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ধর্মের বিজয়ের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিত, এবং তাহাদের ইলহাম ও কাশ্‌ফ বা দিব্য-দর্শন লাভ হইত (সূরা বাকারা 2ঃ 90)। যদিও ঐ সকল ইহুদী যারা হযরত ঈসা (আলায়হেস সালাম)-এর বিরুদ্ধাচরণ করার অপরাধে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অধঃপতিত হইয়াছিল- কিন্তু যখন সৃষ্ট বস্তুর পূজার জন্য খৃষ্টধর্ম ধ্বংস হইল এবং উহার মধ্যে আর সত্য এবং আধ্যাত্মিকতা থাকিল না, তখন সেই যুগের ইহুদীগণ খৃষ্টান না হওয়ার অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করিল। তাই তাহাদের মধ্যে পুনরায় আল্লাহ্‌র জ্যোতির সৃষ্টি হইল এবং তাহাদের মধ্যে প্রায়ই ইলহাম বা দিব্য-দর্শনের অধিকারী ব্যক্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল। তাহাদের সন্ন্যাসীগণের মধ্যে অনেক উন্নত মর্যাদার ব্যক্তি ছিলেন এবং তাহারা সর্বদাই এই ইলহাম লাভ করিতেন যে, শেষ যুগের নবী, যুগ-ইমাম শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করিবেন। এবং এই জন্যই তাহাদের অনেক তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ইলহাম প্রাপ্ত হইয়া আরব দেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাদের শিশু সন্তানগণ পর্যন্ত জানিত যে, শীঘ্রই আকাশ হইতে এক নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে। এই কথাই বলা হইয়াছে নিম্নবর্ণিত আয়াতে ঃ

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

অর্থাৎ 'এই নবী (সাঃ)-কে তাহারা ঠিক তেমনি পরিষ্কারভাবে চিনে, যেভাবে তাহারা আপন সন্তানকে চিনে' (সূরা বাকারা 2 ঃ 147)।

কিন্তু যখন সেই প্রতিশ্রুত নবী- যাঁহার উপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হউক, আবির্ভূত হইলেন, তখন আত্ম-শ্লাঘা এবং বিদ্বেষ অধিকাংশ ইহুদী সন্ন্যাসীর পতন ঘটাইল এবং তাহাদের অন্তর কালিমাযুক্ত হইয়া গেল। যাহারা পবিত্রচেতা ছিলেন তাহারা মুসলমান হইয়া গেলেন এবং তাহাদের ইসলাম গ্রহণ যথার্থ হইল। সুতরাং এই বিষয়টি ভয়ের কারণ এবং অতীব ভয়ের

কারণ যে, আল্লাহ্ কোন বিশ্বাসীর পরিণাম যেন বালআমের ন্যায় দুর্ভাগ্যজনক না করেন। হে আমার প্রভু! তুমি এই উম্মতকে সকল ফেৎনা হইতে রক্ষা কর এবং ইহুদীগণের দৃষ্টান্তসমূহ হইতে ইহাদিগকে দূরে রাখ। আমীন! সুম্মা আমীন!

এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, খোদাতাআলা যেমন সামাজিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠাকল্পে বিভিন্ন গোত্র এবং জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া তাহারা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সাহায্যকারী হয়, তেমনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্যে যাতে এক আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের সৃষ্টি হয় এবং একে অপরের সাহায্যকারী হইয়া যায়, তজ্জন্য তিনি নবুওয়তের এবং ইমামতের ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন।

এখানে একটি জরুরী প্রশ্ন উঠে যে, যুগ-ইমাম কাহাকে বলে এবং তাহাকে চিনিবার আলামতসমূহ কী এবং অপরাপর মুলহাম, স্বপ্নদ্রষ্টা ও দিব্য-দর্শনকারীগণের উপরে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব কী?

এই প্রশ্নের উত্তর ইহাই যে, যুগ-ইমাম তাহাকেই বলে, যাঁহার আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভার খোদাতাআলা স্বয়ং গ্রহণ করিয়া, তাহার প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে নেতৃত্বের এমন এক প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দেন যাহাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পন্ডিত এবং দার্শনিকগণের সহিত সর্বপ্রকার বিতর্কের সভায় তিনি সকলকে পরাভূত করিয়া ফেলেন। তিনি খোদার নিকট হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া সকল প্রকার সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর আপত্তিসমূহের এরূপ যথার্থ উত্তর প্রদান করেন যে, অবশেষে সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, স্বভাবতঃই তিনি দুনিয়ার সংস্কারের নিমিত্ত সকল প্রকার উপকরণসহ এই মুসাফিরখানায় (পৃথিবীতে) অবতীর্ণ হইয়াছেন। এইজন্য তাহাকে কোন শত্রুর নিকট লজ্জিত হইতে হয় না। আধ্যাত্মিকভাবে তিনি মুহাম্মদী ফৌজের সিপাহসালার (সৈন্যাধ্যক্ষ) হন। খোদাতাআলা চাহেন যেন তাহার হাতে ধর্ম দ্বিতীয়বার জয়যুক্ত হয় এবং সমস্ত লোক যাহারা তাহার পতাকা তলে সমবেত হয় তাহাদিগকেও উন্নত মর্যাদার শক্তিসমূহ দান করা হয়। ঐ সমস্ত শর্তাবলী যাহা সংস্কারের জন্য প্রয়োজন, ঐ সকল জ্ঞান যাহা আপত্তিসমূহের খন্ডন এবং ইসলামের সৌন্দর্যাবলী বর্ণনা করিবার জন্য আবশ্যকীয় সবই তাহাকে দান করা হইয়া থাকে। অধিকন্ত তাহাকে পৃথিবীর বেআদব ও দুর্মুখ

ব্যক্তিগণেরও মোকাবেলা করিতে হইবে জানিয়া আল্লাহ্‌তাআলা তাহাকে উচ্চাঙ্গের নৈতিক শক্তি দান করেন এবং মানবজাতির প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি তাহার হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে।

তবে নৈতিক বলের অর্থ ইহা নহে যে, তিনি স্থানে অস্থানে অযথা নম্রতা প্রদর্শন করিবেন, কারণ ইহা চারিত্রিক গুণের নিয়ম বহির্ভূত। বরং ইহার অর্থ এই যে, সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তি যেভাবে শত্রু এবং অশিষ্ট ব্যক্তির কথায় জ্বলিয়া কাবাব হইয়া সহসা মেজাযে পরিবর্তন ঘটায় এবং সেই বেদনাদায়ক কষ্ট অর্থাৎ ক্রোধ অত্যন্ত ঘৃণিতরূপে তাহাদের চেহারায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে, এবং উত্তেজনাপূর্ণ ও আক্রমণাত্মক কথা লাগামহীন ও অসলগ্নভাবে মুখ হইতে নির্গত হইতে থাকে, এইরূপ অবস্থা নীতিবান ব্যক্তির মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। অবশ্য স্থান কাল বিশেষে প্রতিকারকল্পে তিনি কখনও কখনও শক্ত কথা উচ্চারণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু এরূপ অবস্থায় তাহার অন্তরে না কোন জ্বালা থাকে, না তিনি ক্রোধের শিকার হন এবং না তাঁহার মুখ হইতে ক্রোধের বশে ফেনা নির্গত হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ভীতি ও প্রতাপ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত তিনি কৃত্রিম ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু এরূপ সময়েও তাঁহার হৃদয়ে শান্তি এবং আনন্দপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করিতে থাকে। এই কারণেই যদিও বা হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহার বিপক্ষীয়গণের প্রতি প্রায়শঃই শক্ত কথা উচ্চারণ করিতেন, যেমন শূকর, কুকুর, বেঈমান, নারকী ইত্যাদি, তথাপি আমি একথা বলিতে পারি না যে, (নাউযুবিল্লাহ্‌) তিনি নীতি-পরায়ণ ছিলেন না। কারণ তিনি তো স্বয়ং ন্যায়-নীতি শিখাইতেন, নম্রতা প্রদর্শনের জন্য তাগিদ করিতেন। তাঁহার মুখে যে এরূপ শক্ত কথা প্রায়ই উচ্চারিত হইত, তাহা তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া বলিতেন না, বরং স্থান বিশেষে পরম শান্ত ও সুস্থ চিত্তে এ সকল কথা উচ্চারণ করিতেন।

অতএব, এরূপ আদর্শ নৈতিকতার অধিকারী হওয়া ইমামগণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। যদি কোন শক্ত কথা উগ্রতা ও ক্রোধোন্মত্ততা সহকারে উচ্চারিত না হইয়া প্রয়োজনে স্থান ও কাল অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে উহা নীতি বহির্ভূত হয় না। এ কথা বলা আবশ্যক যে, খোদাতাআলার হস্ত যাহাদিগকে ইমাম নিযুক্ত করেন তাহাদের প্রকৃতিতেই ইমামতের শক্তি নিহিত রাখা হয়। যেভাবে আল্লাহ্‌র বিধান এই পবিত্র আয়াত অনুযায়ী ঃ

اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ

অর্থাৎ- প্রত্যেক জীব ও পশু-পক্ষীর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিকে যাহা খোদাতাআলার জ্ঞানে ছিল, আদি হইতে তিনি উহাদের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন (সূরা তাহা 20ঃ51)। অনুরূপভাবে যে সকল ব্যক্তির দ্বারা ইমামতের কাজ লইবেন বলিয়া আল্লাহ্ তাআলা আদি হইতে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও পূর্ব হইতে ইমামতের কাজের উপযোগী কতগুলি আধ্যাত্মিক শক্তির সমাবেশ করিয়া রাখা হয়। যে সকল প্রতিভা ভবিষ্যতে তাঁহাদের কাজে লাগিবে সেগুলির বীজ পূর্ব হইতে তাঁহাদের পূত চরিত্রে বপন করা হয়। আমার দৃষ্টিতে মানব-জাতির মঙ্গল এবং উন্নতি সাধনের নিমিত্ত ইমামের জন্য নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা একান্ত অপরিহার্য:

প্রথম : নৈতিক বল। যেহেতু ইমামকে নানা শ্রেণীর দুবৃত্ত, হীনমনা ও দুর্মুখ ব্যক্তিগণের সম্মুখীন হইতে হয়, তজ্জন্য তাঁহার উত্তম নৈতিক শক্তির অধিকারী হওয়া আবশ্যক, যেন তাঁহার মধ্যে ক্রোধ ও উন্মাদনার উত্তাপ সৃষ্টি না হয় এবং যার ফলে মানব জাতি তাঁহার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত না থাকে। ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা যে, এক ব্যক্তি নিজেকে খোদার বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেয় অথচ হীন আচরণ প্রকাশ করে এবং কটু কথা একেবারেই সহ্য করিতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজেকে যুগ-ইমাম বলিয়া পরিচয় দেয় অথচ এরূপ নীচতা প্রদর্শন করে যে, সামান্য সামান্য কথায় উগ্র হইয়া উঠে এবং চক্ষু অগ্নিবর্ণ ধারণ করে সে কোন ক্রমেই যুগ-ইমাম হইতে পারে না। তাহার মধ্যে তো

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

অর্থাৎ- নিশ্চয় তুমি উত্তম চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত (সূরা কালাম 68 ঃ 5) -আয়াতটি সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয় : নেতৃত্বের শক্তি, যেজন্য তাঁহার নাম ইমাম রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ সৎবাক্য, পুণ্যকর্ম এবং সকল প্রকার ঐশী তত্ত্ব-জ্ঞান ও ঐশী-প্রেমের মধ্যে তিনি অগ্রগামী থাকিবার আগ্রহ রাখিবেন এবং তাঁহার আত্মা কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে বা কোন প্রকার অপরিপক্ক অবস্থায় অবস্থান

করিতে পছন্দ করে না। উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হওয়াকে তিনি অত্যন্ত দুঃখ এবং বেদনার চক্ষে দেখেন। ইহা এক স্বভাবজ শক্তি যাহা ইমামের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ঘটনাক্রমে যদি তাঁহার শিক্ষা ও তত্ত্ব-জ্ঞান গ্রহণ করিবার মত কেহ না-ও থাকে এবং তাঁহার আলোকের অনুসরণ কেহ না-ও করে, তথাপি তিনি আপন স্বভাবজাত শক্তিতে ইমাম। সুতরাং এই সূক্ষ্মতত্ত্বপূর্ণ কথাটি মনে রাখিবার মত যে, ইমামত হইল এক শক্তি যাহা সেই ব্যক্তির স্বভাবের মধ্যে নিহিত রাখা হয় যাঁহাকে আল্লাহ্ এই কাজের জন্য মনোনীত করেন। আর যদি 'ইমামত' শব্দটির অর্থ করা হয় তবে ইহার অর্থ হইবে 'অগ্রগমন শক্তি'।

অতএব, ইহা কোন সাময়িক বা আকস্মিক পদবী নহে, যাহা পরে তাঁহার উপরে আরোপিত হয়। বরং ইহা দর্শন, শ্রবণ এবং উপলব্ধি করিবার শক্তির ন্যায় একটি শক্তি বিশেষ। অনুরূপভাবে ইহা 'অগ্রগমন শক্তি' এবং ঐশী বিষয়াবলীতে শীর্ষস্থান লাভ করিবার শক্তি বিশেষ। 'ইমামত' শব্দটি এই অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করে।

তৃতীয় : জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা, যাহা ইমামের জন্য জরুরী এবং অপরিহার্য একটি গুণ। যেহেতু ইমামতের তাৎপর্য-সকল সত্য, তত্ত্ব-জ্ঞানে, প্রেমের আবশ্যকীয় উপাদানে, সততা ও বিশ্বস্ততায় অগ্রগামী হওয়া-সেই হেতু তিনি তাঁহার সমুদয় শক্তিকে এই পথে নিয়োগ করেন এবং رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (অর্থাৎ হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে বর্ধিত করিয়া দাও' (সূরা তাহা 20 ঃ 115)- প্রার্থনায় সকল সময় রত থাকেন। তাঁহার অনুভূতি এবং জ্ঞান এই বিষয়সমূহের জন্য প্রথম হইতেই যোগ্য প্রতিভাসম্পন্ন হয়। এইজন্য খোদাআতালার মেহেরবানীতে তাঁহাকে ঐশী জ্ঞানে গভীরতা ও ব্যাপকতা প্রদান করা হইয়া থাকে। কুরআনের জ্ঞান, কল্যাণ বিতরণের উৎকর্ষ এবং অখন্ডনীয় যুক্তিতে তাঁহার যুগে কেহই তাঁহার সমকক্ষ থাকে না। তাঁহার সঠিক সিদ্ধান্তের আলোকে সকলের জ্ঞানের সংশোধন হয়। ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে যদি কাহারও মত তাঁহার অভিমতের বিরোধী হয়, তাহা হইলে তাঁহার অভিমতই গ্রহণীয়, যেহেতু অন্তর্দৃষ্টির আলো তাঁহাকে তত্ত্ব-জ্ঞান জানিতে সাহায্য করিয়া থাকে। এরূপ আলো ঐ উজ্জ্বল কিরণ সহকারে অপর কাহাকেও দেওয়া হয় না।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ

(অর্থাৎ, ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাহাকে চাহেন দান করিয়া থাকেন-সূরা জুমু'আ 62 ঃ 5)

অতএব, মুরগী যেভাবে আপন ডানার নীচে ডিমগুলিকে তা দিয়া বাচ্চা ফুটাইয়া তোলে এবং স্বীয় ডানার আশ্রয় তলে উহাদিগকে রাখিয়া আপন স্বভাব উহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেয় তদ্রুপ এই ব্যক্তি তাঁহার সাহচর্য অবলম্বনকারীদেরকে স্বীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের রঙ্গে রঙ্গীন করিয়া তোলেন এবং তাহাদিগকে বিশ্বাস ও তত্ত্ব-জ্ঞানে অগ্রগামী করেন। কিন্তু অপরাপর মুলহাম এবং সাধকগণের নিমিত্ত এই প্রকার জ্ঞানের ব্যাপকতার প্রয়োজনীয়তা নাই। কেননা, মানবজাতির শিক্ষার ভার তাহাদের উপর অর্পিত হয় না। এই শ্রেণীর সাধক এবং সত্য-স্বপ্ন দর্শনকারীগণের জ্ঞানের কিছু অভাব এবং অজ্ঞতাও থাকিয়া যায়, তথাপি ইহা তাহাদের ক্ষেত্রে দোষণীয় নহে, যেহেতু তাহারা কোন তরীর কান্ডারী নহে, বরং তাহারা নিজেরাই কান্ডারীর মুখাপেক্ষী। অবশ্য তাহাদের এরূপ অসার ধারণা থাকা উচিত নহে যে, তাহাদের আধ্যাত্মিক কান্ডারীর কোন প্রয়োজন নাই- 'আমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য যথেষ্ট।' তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাহাদের জন্য নিশ্চয় যুগ-ইমামের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, যেরূপভাবে স্ত্রীলোকের জন্য পুরুষের আবশ্যকতা আছে।

খোদাতাআলা প্রত্যেককেই একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, যে ব্যক্তিকে ইমামতের জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই, সে যদি মুখে উহার দাবী করে, তাহা হইলে একজন নির্বোধ সাধু যেভাবে এক সম্রাটের সম্মুখে হাস্যাস্পদ হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি তদ্রুপ নিজেই হাস্যাস্পদ হইবে। উক্ত ঘটনাটি এইরূপঃ কোন এক শহরে এক সাধক বাস করিত। সে পুণ্যকর্মে ব্রতী এবং ধর্মভীরু ছিল বটে, কিন্তু জ্ঞান বলিতে তাহার কিছু ছিল না। সম্রাট তাহাকে খুব ভক্তি করিতেন। কিন্তু তাহার মূর্খতার জন্য উজির তাহাকে ভক্তি করিতেন না। একদা সম্রাট মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সাধু অযথা প্রগলভতাবশতঃ ইসলামী ইতিহাস সম্বন্ধে অনধিকার চর্চা করিয়া বসিল। সে বলিল, 'রোম নিবাসী আলেকজান্ডার এই

উম্মতে একজন নামজাদা সম্রাট ছিলেন।' মন্ত্রীবর ইহাতে টীপ্পনী কাটিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "দেখুন হুযুর, ফকির সাহেব আধ্যাত্মিক সাধনা ছাড়াও ইতিহাস শাস্ত্রে বেশ দখল রাখেন!"

সুতরাং যুগ-ইমামের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধবাদী ও সাধারণ অনুসন্ধানীগণের তুলনায় জ্ঞানের ক্ষমতার যত বেশী আবশ্যক, ইলহাম তত বেশী আবশ্যকীয় নহে। কেননা, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান, ভূগোল ও ইসলাম অনুমোদিত গ্রন্থাবলী, ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্রাদির তরফ হইতেও শরীয়তের বিরুদ্ধে বহু প্রকারের আপত্তি উত্থাপনকারী বিদ্যমান রহিয়াছে। যুগ-ইমামকে পবিত্র ইসলামের রক্ষক বলা হইয়া থাকে এবং তাঁহাকে আল্লাহ্তাআলার পক্ষ হইতে এই বাগানের মালী বানানো হয়। সকল প্রকার আপত্তি খন্ডন করা এবং সকল বিরুদ্ধবাদীর মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য। শুধু ইহাই নহে। আপত্তি খন্ডন করা ছাড়াও ইসলামের গুণাবলী ও সৌন্দর্য জগতে প্রকাশ ও প্রচার করা তাঁহার অন্যতম কর্তব্য। অতএব এইরূপ ব্যক্তি সম্মানের উপযুক্ত পাত্র এবং দুর্লভ পরশ মণিতুল্য, কেননা তাঁহার অস্তিত্ব হইতেই ইসলামের বিকাশ ঘটিয়া থাকে এবং তিনি ইসলামের জন্য এক গৌরব এবং মানবজাতির জন্য খোদাতাআলার (অস্তিত্বের) অকাট্য প্রমাণস্বরূপ। তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়া, কাহারও জন্য বৈধ নহে; কারণ তিনি আল্লাহ্র ইচ্ছা এবং আদেশানুযায়ী ইসলামের ইজ্জতের অভিভাবকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি সমগ্র মুসলিম জগতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ধর্মের সকল ঔৎকর্ষের বেষ্টনীস্বরূপ। ইসলাম এবং কুফরীর প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র তিনিই কাজে আসেন এবং তাঁহারই পবিত্র নিঃশ্বাস (অর্থাৎ দোয়া ও অমৃতবাণী) অধর্মের বিলোপ সাধন করে। তিনিই পূর্ণ এবং বাকী সকলে তাঁহার অংশস্বরূপ।

او چو کل و تو چو جزئی نے کلی
تو ہلاک استی اگر از وے بگسلی*

* তিনি পূর্ণ এবং তুমি অংশ বিশেষ; কিন্তু পূর্ণ নহ। যদি তুমি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হও, তাহা হইলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।-অনুবাদক

চতুর্থ : দৃঢ়চিত্ততা- ইহা যুগ-ইমামের জন্য একান্ত জরুরী। দৃঢ়চিত্ততার অর্থ এই যে, কোন অবস্থাতেই ক্লান্ত না হওয়া, হতাশ না হওয়া এবং সংকল্পে শিথিল না হওয়া। নবী, মুরসাল বা মোহাদ্দাস, যাঁহারা যুগ-ইমাম হন, তাঁহাদের সম্মুখে অনেক সময় এরূপ পরীক্ষা উপস্থিত হয় যে, বাহ্যতঃ তাহারা এমনভাবে বিপদাপন্ন হইয়া পড়েন যাহা দেখিয়া মনে হয় যেন খোদাতাআলা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। আবার অনেক সময় ওহী এবং ইলহামের ধারাও সাময়িকভাবে তাঁহাদের জন্য বন্ধ হইয়া যায় এবং কিছু দিন পর্যন্ত কোন ওহী হয় না। তাঁহাদের কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীও অনেক সময় পরীক্ষার আকারে প্রকাশিত হয় এবং সর্বসাধারণ্যে তাঁহাদের সত্যতা প্রকাশিত হয় না। কখনও তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং এমন সময়ও আসে, যখন জগতে তাঁহারা পরিত্যক্ত, উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত বলিয়া প্রতীয়মান হন। প্রত্যেক ব্যক্তি যে তাঁহাদিগকে গালি দেয়, সে মনে করে- 'এতদ্দ্বারা আমি মহাপুণ্যের কাজ করিতেছি' এবং প্রত্যেকেই তাঁহাদিগকে ঘৃণা ও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে, এমনকি তাঁহাদের সালামের উত্তরও দিতে চায় না। কিন্তু এইরূপ সময়েই তাঁহাদের দৃঢ়চিত্ততার পরীক্ষা হইয়া থাকে। তাহারা এই সকল পরীক্ষায় মোটেই বিচলিত হন না এবং স্বীয় ব্রতেও বিন্দুমাত্র শিথিল হন না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সাহায্যের দিন সমাগত হয়।

পঞ্চম ঃ আল্লাহ্‌র সম্মুখবর্তী হওয়া - ইহাও যুগ-ইমামের জন্য আবশ্যকীয়। আল্লাহ্‌র সম্মুখবর্তী হওয়ার অর্থ এই যে, বিপদ এবং পরীক্ষার দিনে বিশেষতঃ ঘোর শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার সময়ে এবং নিদর্শন প্রদর্শনের দাবী বা বিজয়ের প্রয়োজনে বা কাহারও প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের আবশ্যকতায় তিনি খোদার প্রতি অবনত হন। এরূপভাবে অবনত যে, তাহার সত্যতা, সততা, প্রেম, বিশ্বস্ততা এবং দৃঢ় চিত্ততাপূর্ণ প্রার্থনায় আধ্যাত্মিক জগতে এক সাড়া পড়িয়া যায় এবং তাঁহার ঐকান্তিক আত্মবিলীনতায় আকাশে এক সাড়া পড়িয়া যায় এবং তাঁহার ঐকান্তিক আত্মবিলীনতায় আকাশে এক বেদনাদায়ক আলোড়নের সৃষ্টি হইয়া ফিরিশতাগণকে বিচলিত করিয়া তোলে। প্রচন্ড গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিবসের অবসানে বর্ষার সূচনায় যেমন মেঘের সঞ্চার হইতে থাকে, তেমনি তাঁহার খোদার প্রতি পূর্ণ ভরসার ফলস্বরূপ অর্থাৎ

আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি গভীর আত্মনিবেদনের উত্তাপে আকাশে এক নবতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া যায়, ভাগ্যাকাশে পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ভিন্ন রঙ ধারণ করে এবং অবশেষে ভাগ্য ও নিয়তির হিমেল হাওয়া বহিতে শুরু করে। আল্লাহ্‌র আদেশে যেমন জ্বরের জীবাণু সৃষ্টি হইয়া থাকে, আবার তাঁহারই আদেশে জোলাপের ঔষধ ঐ জীবাণুকে বাহির করিয়া ফেলে, তেমনি খোদার পালোয়ানগণের খোদার উপর পূর্ণ ভরসার ফলও ঐরূপ হইয়া থাকে।

آں دعائے شیخ نے چوں ہر دعاست
فانی است و دستِ او دستِ خداست *

যুগ-ইমামের খোদার প্রতি সম্মুখবর্তী হওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি আত্ম-নিবেদন সমস্ত সাধককুলের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী এবং দ্রুত ফলপ্রসূ হইয়া থাকে, যেমন কিনা হযরত মূসা (আঃ) তাঁহার যুগের ইমাম ছিলেন এবং বালআম ছিলেন সেই যুগের সাধক, আল্লাহ্‌র সাথে যাহার বাক্যলাপের সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। তাহার প্রার্থনাও মঞ্জুর হইত। কিন্তু যখন সে হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হইল, তখন এই মোকাবেলা বালআমকে এমনভাবে ধ্বংস করিয়া দিল, যেমন এক তীক্ষ্ণধার তরবারি মুহূর্তেই দেহ হইতে মস্তককে বিছিন্ন করিয়া ফেলে।

হতভাগ্য বালআমের এই দার্শনিক তত্ত্ব জানা ছিল না যে, খোদাতাআলা কাহাকেও বাণী দ্বারা সম্মানিত করিয়া আপন প্রিয় এবং মনোনীত বলিয়া গণনা করিলেও সে যদি এমন এক ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হয়, যে তাহার অপেক্ষা আল্লাহ্‌র অধিক প্রিয়ভাজন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে। তখন কোন প্রত্যাদেশবাণী তাহার কাজে আসিবে না এবং এক সময়ে যে তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইত, তাহাও আর তাহার সাহায্যে আসিবে না। এতো একজন বালআমের কথা। কিন্তু আমি জানি আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর

* বুযুর্গের ঐ দোয়াই (শুধু) নহে, বরং, সকল দোয়াই (তাঁর) গৃহীত; (কারণ) তিনি তাঁহার মধ্যে বিলীন, তিনি খোদার হস্ত-স্বরূপ।-অনুবাদক

সময়ে এরূপ সহস্র বালআম ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, যেরূপভাবে ইহুদী সন্ন্যাসীগণ খৃষ্টীয় ধর্মের মৃত্যুর পর অধিকাংশই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ষষ্ঠঃ দিব্য দর্শন এবং প্রত্যাদেশ (কাশ্‌ফ এবং ইলহাম) লাভও যুগ-ইমামের জন্য আবশ্যকীয়। যুগ-ইমাম প্রায়ই ইলহামের সাহায্যে আল্লাহ্‌তাআলার নিকট হইতে জ্ঞানরাশি, অকাট্য ও সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী লাভ করিয়া থাকেন। অন্যের সহিত তাঁহার ইলহামের তুলনাই হয় না। কারণ সংখ্যায় এবং গুণগত বৈশিষ্ট্যে তাহা এত উচ্চাঙ্গের হইয়া থাকে যে, উহার নাগাল পাওয়া মানবের সাধ্যাতীত। ইহার সাহায্যে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় এবং জ্ঞানরাশি ও কুরআনের তত্ত্ব বোধগম্য হয়, ধর্ম সম্বন্ধীয় জটিল সমস্যার সমাধান হয় এবং ভ্রান্ত সংস্কার দূরীভূত হয়। অধিকন্তু উচ্চ শ্রেণীর ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশিত হয়, যদ্দারা বিরুদ্ধবাদীগণের উপর প্রভাব বিস্তার সম্ভব হয়।

সুতরাং যাহারা যুগ-ইমাম হন, তাহাদের দিব্য-দর্শন ও ইলহাম শুধু তাঁহাদের নিজেদের সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু এগুলি ধর্মের সাহায্য এবং ঈমানের দৃঢ়তার জন্য অতীব উপকারী ও কল্যাণকর হইয়া থাকে। খোদাতাআলা এইসব ব্যক্তির সহিত অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে কথাবার্তা বলিয়া থাকেন এবং তাহাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়া থাকেন। অনেক সময় প্রশ্ন এবং উত্তরের এক প্রস্রবণ খুলিয়া যায়, যাহাতে একই সময়ে প্রথমে প্রশ্ন এবং উত্তর, আবার প্রশ্ন ও উহার উত্তর এইরূপ বার বার প্রশ্ন এবং উত্তরের ধারা এরূপ পরিষ্কার, আনন্দদায়ক উত্তম প্রকাশব্যাঞ্জক ইলহামের আকারে প্রকাশিত হইতে থাকে যে, প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে থাকেন, যেন তিনি স্বয়ং খোদাতাআলাকে দেখিতেছেন। যুগ-ইমামের নিকট এরূপ কোন ইলহাম হয় না, যেরূপ কোন তীরন্দাজ আড়াল হইতে তীর ছুঁড়িয়া সরিয়া পড়ে যাহাতে ইহা বুঝা যায় না যে, ঐ ব্যক্তি কে ছিল এবং কোথায় গেল। বরং খোদাতাআলা এই ব্যক্তির অত্যন্ত নিকটবর্তী হন এবং তাঁহার সমক্ষে স্বীয় পবিত্র ও জ্যোতির্ময় চেহারা যাহা শুধুই জ্যোতিঃ, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ আবরণ অপসারিত করিয়া দেন। এরূপ অবস্থা অন্য কাহারও ভাগ্যে জোটে না। বরং অন্যেরাতো অনেক সময় নিজেদের ইলহাম প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এরূপ অনুভব করে, যেন কেহ তাহাদের সহিত পরিহাস করিতেছেন। যুগ ইমামের ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ সকল ভবিষ্যৎকে সুস্পষ্ট করিয়া দেয় **ইযহার আলালগায়েব**

(অদৃশ্যের উপরে প্রাধান্য বিস্তার)-এর মর্যাদা রাখে অর্থাৎ উহা অদৃশ্য ভবিষ্যতের সমুদয় দিককে স্বীয় আয়ত্তে লইয়া আসে, যেমন সুদক্ষ অশ্বারোহী আপন ঘোড়াকে স্বীয় আয়ত্তে রাখে। তাঁহার ইলহামে এই প্রকারের শক্তি ও প্রাঞ্জলতা এই জন্যই দেওয়া হয় যে, যাহাতে তাঁহার পবিত্র ইলহাম শয়তানী ইলহামের সহিত সন্দেহযুক্ত না হয় এবং উহা যেন দলিল প্রমাণে সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়।

জানিয়া রাখ যে, শয়তানী ইলহাম হওয়াও বাস্তবসত্য, যাহা অপরিপক্ক সাধকগণের নিকট হইয়া থাকে। এগুলি 'হাদীসুন্ নফস্' বা মনের কথা (Inner voice-অন্তর্স্বর)। অথবা 'আযগাসুল আহ্লাম' বা এলোমেলো স্বপ্ন হইতে পারে। যে ইহা অস্বীকার করে সে কুরআন শরীফের বিরুদ্ধাচরণ করে। কারণ, কুরআন শরীফের বর্ণনার দ্বারা শয়তানী ইলহামের সম্ভাব্যতা সাব্যস্ত। আল্লাহ্তাআলা বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের আত্মশুদ্ধি পূর্ণ ও পরিপক্ক না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার নিকট শয়তানী ইলহাম হইতে পারে এবং সে عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ (অর্থাৎ শয়তানী ইলহাম প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপাচারীর উপর অবতীর্ণ হয়) আয়াতের অধীনে আসিতে পারে। কিন্তু যাঁহারা পবিত্র তাঁহাদিগকে অবিলম্বে শয়তানী প্ররোচনা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। (সূরা শো'আরা 26 ঃ 223)

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, কতক পাদরী সাহেব তাহাদের রচিত পুস্তকে শয়তান কর্তৃক হযরত ঈসা (আঃ)-কে পাহাড়ের উপর ডাকিয়া লইয়া যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে যে ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাহারা হঠকারিতার পরিচয় দিয়া বর্ণনা করিয়াছে যে, ইহা কোন বাহ্যিক ঘটনা ছিল না যাহা পৃথিবীর লোক বা ইহুদীগণ দেখিতে পাইত। বরং এইরূপ শয়তানী ইলহাম হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর নিকট তিনবার হইয়াছিল এবং তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই।

কিন্তু বাইবেলের এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে যে, মসীহ্! অথচ তাঁহার নিকট শয়তানী ইলহাম? কিন্তু হ্যাঁ- যদি শয়তানের সহিত এই কথোপকথনকে শয়তানী ইলহাম বলিয়া না মানিয়া এই ধারণা করা যায় যে, শয়তান মানুষের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া হযরত ঈসা (আঃ)-এর

সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, তাহা হইলে আপত্তি উঠে যে, শয়তান, যাহা পুরাতন সর্প, যদি সত্য সত্যই দেহ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইয়া ইহুদীগণের পবিত্র পূজা মন্দিরের নিকট, যাহার চারিপাশে শত শত মানুষ থাকিত, মনুষ্য সাজিয়া দন্ডায়মান হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে দেখিবার জন্য হাজার হাজার লোক আসিয়া জড় হইত। বরং হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর উচিত ছিল, স্বয়ং ইহুদীদিগকে ডাকিয়া আনিয়া শয়তানকে দেখাইয়া দেওয়া, যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি সম্প্রদায় অবিশ্বাসী ছিল। এমতাবস্থায় শয়তানকে সশরীরে দেখাইয়া দেওয়া হযরত মসীহ্ (আঃ)- এর সত্যতার একটি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত। ইহা দ্বারা বহুলোক হেদায়াতপ্রাপ্ত হইত এবং রোম সম্রাটের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ শয়তানকে দেখিয়া এবং পুনঃ তাহাকে উড়িয়া ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া নিশ্চয়ই হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর অনুগামী হইয়া পড়িত! কিন্তু এরূপ হয় নাই। অতএব প্রতীয়মান হয় যে, ইহা এক প্রকার আধ্যাত্মিক কথোপকথন ছিল যাহাকে অন্য কথায় 'শয়তানী ইলহাম' বলা যাইতে পারে।

কিন্তু আমার ধারণা ইহাও যে, ইহুদীদের শাস্ত্রে অনেক দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিকে 'শয়তান' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং এই প্রথা ও বাচনভঙ্গী অনুযায়ীই হযরত মসীহ্ও ইঞ্জীলে উক্ত ঘটনা বর্ণনার মাত্র কয়েক ছত্র পূর্বে এক বিশিষ্ট শিষ্যকে, যাহাকে স্বর্গের চাবি দেওয়া হইয়াছিল, 'শয়তান' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অতএব এমনও হইতে পারে যে, কোন দুষ্ট ইহুদী বিদ্রুপ ও উপহাস করিবার নিমিত্ত হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর নিকট আসিয়াছিল এবং যেভাবে পিটারকে তিনি 'শয়তান' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন তদ্রুপ তাহাকেও 'শয়তান' বলিয়া আখ্যায়িত করেন। ইহুদীদের মধ্যে এই প্রকার শয়তানীর বহুল প্রচলন ছিল এবং এরূপ প্রশ্ন করাও তাহাদের অভ্যাস ছিল। আবার ইহাও সম্ভব ছিল যে, এই সকল কথা সর্বৈব মিথ্যা। কেহ হয়ত একথা দুষ্টামি করিয়া বা ধোঁকায় পড়িয়া লিখিয়া গিয়াছে। কেননা, এই ইঞ্জীলগুলি হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর ইঞ্জীল নহে এবং সত্য ও সঠিক বলিয়া তাঁহার অনুমোদিতও নহে বরং এইগুলি তাঁহার শিষ্যগণ বা অন্য কেহ আপন ধারণা এবং বুদ্ধি অনুযায়ী লিখিয়া গিয়াছে। সেইজন্যও এইগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধী অনেক

কথাও রহিয়াছে। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে যে, লেখকগণের এরূপ ধারণা করা ভুল হইয়াছে। যেমন ইহা একটি ভুল যে, ইঞ্জীল লেখকগণের মধ্যে অনেকে এরূপ ধারণার বশবর্তী যে, হযরত মসীহ্ ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এরূপ ভুল-ভ্রান্তি করা হাওয়ারীগণের (শিষ্যগণের) স্বভাবে নিহিত ছিল কারণ ইঞ্জীল* হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, তাহাদের বুদ্ধি তেমন সূক্ষ্ম ছিল না। হযরত মসীহ্ (আঃ) স্বয়ং তাহাদের অপরিপক্ক অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, তাহারা বুদ্ধি, বিবেচনা এবং কর্ম-শক্তিতেও অত্যন্ত দুর্বল ছিল।

যাহা হউক, একথা সত্য যে, পবিত্রাত্মাগণের হৃদয়ে শয়তানী ধ্যান-ধারণা স্থান লাভ করিতে পারে না। কোন ইতস্ততঃ ভ্রান্ত-ধারণা যদি তাহাদের মনের কোণে উদিতও হয় তবুও সেই শয়তানী ধ্যান-ধারণা অবিলম্বে বিদূরীত ও বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাঁহাদের পবিত্র চিত্তে কোন কালিমা স্পর্শ করে না।

এরূপ হাল্কা-বিবর্ণ ও অপরিপক্ক চিন্তার প্ররোচনাকে কুরআন শরীফে طائف (তায়িফ) বলা হইয়াছে, আরবী অভিধানেও ইহাকে طَيف, طَيف, طائف,طَوف বলা হয়। হৃদয়ের সহিত এইরূপ প্ররোচনার সংযোগ অতি অল্পই হইয়া থাকে; এমনকি হয় না বলিলেও চলে। অর্থাৎ এরূপ বলা যায়-যেমন দূর হইতে কোন বৃক্ষের ছায়া খুবই অস্পষ্ট হইয়া পতিত হয়, এই প্ররোচনাও তদ্রুপ হইতে পারে, বিতাড়িত শয়তান হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর হৃদয়ে এই প্রকারের সূক্ষ্ম প্ররোচনা দিতে ইচ্ছা করিলেন তিনি তাঁহার নবুওয়তের শক্তির বলে উক্ত বিভ্রান্তিকর প্ররোচনাকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন।

আমাকে একথা এইজন্য বাধ্য হইয়া বলিতে হইল যে, এরূপ কেচ্ছা শুধু ইঞ্জীলেই বর্ণিত হয় নাই বরং ইহা আমাদের সহী হাদীসেও স্থান লাভ করিয়াছে। যেমন লিখিত আছে ঃ

* খৃষ্টানদের অনেকগুলি ইঞ্জীলের মধ্য হইতে এখনও একটি ইঞ্জীল তাহাদের নিকট রহিয়াছে যাহাতে লিখিত আছে যে, হযরত মসীহ্ ক্রুশে মারা যান নাই। এই বর্ণনা সত্য, কারণ 'মরহমে ঈসা' (ঈসার মলম), যাহা তাঁহার ক্ষত স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহার সমর্থন করে এবং যাহার উল্লেখ শত শত চিকিৎসকগণ করিয়া গিয়াছেন।

عن محمد بن عمران الصيرفى قال حدثنا الحسن بن عليل العنزى عن العباس بن عبدالواحد۔ عن محمد بن عمرو۔ عن محمد بن مناذر۔ عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار۔ عن طاؤس عن ابى هريرة قال جاء الشيطٰن الٰى عيسَى۔ قال الست تزعم انک صادق قال بلٰى قال فاوف على هذه الشاهقة فالق نفسک منها فقال ويلک الم يقل الله يا ابن ادم لا تبلنى بهلاکک فانى افعل ما اشاء*

মোহাম্মদ বিন ইমরান সায়রফী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে তিনি উহা হাসান বিন আলীল আনযী হইতে, আব্বাস বিন আব্দুল ওয়াহেদ হইতে, আব্বাস মোহাম্মদ বিন আমর হইতে, মোহাম্মদ বিন মনাযের, সুফিয়ান বিন আয়্যিনিয়্যা হইতে সুফিয়ান আমর বিন দীনার হইতে, আমর বিন দিনার তাউস হইতে এবং তাউস আবূ হুরায়রা হইতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, শয়তান ঈসা (আঃ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, 'তুমি কি মনে কর না যে, 'তুমি সত্যবাদী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'কেন করিব না?' তখন শয়তান বলিল 'যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি এই পাহাড়ের উপর চড়িয়া নিজেকে নিম্নে নিক্ষেপ কর দেখি? হযরত ঈসা (আঃ) বলিলেন, তুই নিপাত যা! তুই কি অবগত নস যে, আল্লাহ্তাআলা বলিয়াছেন -'নিজের মৃত্যু নিয়া আমার শক্তির পরীক্ষা করিও না কেননা, আমি যাহা চাই তাহাই করিতে পারি।'

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জীবরাঈল (আঃ) যেভাবে নবীগণের নিকট আগমন করেন, শয়তানও (হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট) সেইভাবে আগমন করিয়া থাকিবে। কেননা, জীবরাঈল মানুষের ন্যায় তো গাড়ী-ঘোড়া চড়িয়া, পাগড়ী বাঁধিয়া, চাদর জড়াইয়া আসেন না বরং তাঁহার আগমন আধ্যাত্মিকভাবে ঘটিয়া থাকে। অতএব নীচ ও ঘৃণিত শয়তান কেমন করিয়া প্রকাশ্যে মানুষের

* আল্ আগানী , লিআবিল ফরজ আল্আস্ফাহানী আখবার ইবনে মুনাজির ওয়া নাসাবুহু, ভাগ-১৮ , পৃষ্ঠা- ২০৭, দার ইহয়াউত্বারাস আল্ আরবী । বেয়রুত থেকে প্রকাশিত । - প্রকাশক কাদিয়ান

মূর্তি ধরিয়া আসিবে?

এই আলোচনার পর অবশ্য ড্রেপার সাহেবের কথা স্বীকার করিতে হয় যাহা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু ইহা বলা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহার নবুওয়তের শক্তি এবং তত্ত্ব-জ্ঞানের আলোকে শয়তানী এলকা বা প্রেরণাকে কিছুতেই নিকটে আসিতে দেন নাই এবং উহাকে দূরীভূত এবং বিনষ্ট করিবার কার্যে অবিলম্বে তৎপর হইয়া গেলেন। যেরূপ আলোর সম্মুখে অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না, সেরূপ শয়তান তাঁহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

["নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর হে শয়তান আদৌ তোমার কর্তৃত্ব নাই'- অনুবাদক -সূরা হিজ্‌র 15 ঃ 43)

- এই আয়াতের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য। কারণ শয়তানের আধিপত্য অর্থাৎ প্রভাব প্রকৃতপক্ষে তাহাদেরই উপরে পড়ে, যে শয়তানের প্ররোচনা এবং আহ্বানকে গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু যে সকল ব্যক্তি আলোকের তীর ছুঁড়িয়া দূর হইতে শয়তানকে ঘায়েল করে এবং তাহার মুখের উপর তিরস্কার এবং প্রত্যাখ্যানের পাদুকাঘাত করে এবং তাহার প্রলাপ বাক্যে কর্ণপাতও করে না, সেইসব ব্যক্তি শয়তানী স্পর্শ হইতে নিরাপদ থাকে। কিন্তু যেহেতু খোদা এই সকল ব্যক্তিকে স্বর্গ এবং মর্ত্য উভয় রাজ্যের প্রকাশ দেখাইতে চাহেন এবং যেহেতু শয়তান মর্ত্যের অধিবাসী, সেহেতু শয়তান নামক এই অত্যাশ্চর্য সৃষ্টির স্বরূপ দেখা ও তাহার কথা শ্রবণ করাও তাহাদের জ্ঞানের ভান্ডারকে পূর্ণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহাদের নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র আঁচলে কোন দাগ লাগে না। শয়তান তাহার কুপ্ররোচনা দানের চিরাচরিত পদ্ধতি অনুযায়ী হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর নিকট দুরভিসন্ধিমূলক এক আবেদন জানাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পবিত্র স্বভাব তৎক্ষণাৎ উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, গ্রহণ করে নাই। এই ঘটনায় তাঁহার মর্যাদার কোন হানি ঘটে নাই। বাদশাহগণের সমক্ষে কি কোন দুষ্ট ব্যক্তি কখনও কথা বলে না? তেমনি আধ্যাত্মিক উপায়ে শয়তান হযরত ঈসা (আঃ)-এর অন্তরে আপন কথা নিক্ষেপ করিয়াছিল, কিন্তু ঈসা (আঃ) সেই শয়তানী ইলহাম কবুল

করেন নাই, বরং প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অতএব, ইহাতো তাঁহার প্রশংসারই কথা। ইহা লইয়া কূট তর্ক করা মূর্খতা এবং আধ্যাত্মিক দর্শন সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) যেভাবে আপন জ্যোতির কষাঘাতে শয়তানী চিন্তাকে দূরীভূত করিয়াছিলেন এবং সাথে সাথে তাহার ইলহামের অপবিত্রতা দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক সাধু ও সুফীর পক্ষে সম্ভব নহে।

সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) বলিয়াছেন, "একবার আমারও শয়তানী ইলহাম হইয়াছিল।" শয়তান কহিল, "হে আবদুল কাদের। তোমার সকল ইবাদত কবুল হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে অপর সকলের জন্য যাহা হারাম, তোমার জন্য তাহা হালাল এবং নামায হইতেও তোমাকে মুক্তি দেওয়া হইল, যাহা খুশী করিতে পার।" তখন আমি বলিলাম, 'রে-শয়তান! দূর হইয়া যা। যাহা নবী (সাঃ)-এর জন্য বিধি-সঙ্গত হয় নাই, তাহা আমার জন্য কীরূপে হইবে? তখন শয়তান আপন সুবর্ণ সিংহাসন সহ আমার দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। যেহেতু আবদুল কাদেরের ন্যায় আল্লাহ্-প্রাপ্ত সিংহ পুরুষেরও যখন শয়তানী ইলহাম হইয়াছে, তখন সাধারণ মানুষ যাহারা এখনও সাধনায় সফলতা লাভ করে নাই তাহারা উহা হইতে কীরূপে রক্ষা পাইতে পারে? তাহাদের সে জোতির্ময়দৃষ্টি কোথায় যদ্বারা তাহারা সৈয়্যদ আবদুল কাদের এবং হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর ন্যায় শয়তানী ইলহামের স্বরূপ চিনিবে?

স্মরণ রাখিও, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবে যে অসংখ্য গণকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহারা অগণিত শয়তানী ইলহাম প্রাপ্ত হইত। অনেক সময় তাহারা ইলহামের সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণীও করিত এবং মজার কথা এই যে, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কতকগুলি সত্যও হইয়া যাইত। ইসলামী পুস্তকে এ সম্বন্ধে বহু গল্প বর্ণিত আছে। অতএব, যে ব্যক্তি শয়তানী ইলহামের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সে নবীগণের (আঃ)-এর সমুদয় শিক্ষাকে এবং নবুওয়তের সকল কার্যক্রমকেও অস্বীকার করে।

বাইবেলে লিখিত আছে যে, একদা চারি শত নবীর উপর শয়তানী

ইলহাম হইয়াছিল। এই ইলহাম ছিল এক শ্বেতকায় জীনু-এর কারসাজি, যদ্দারা তাঁহারা এক সম্রাটের বিজয় লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সম্রাট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয় এবং অত্যন্ত লাঞ্ছনার সহিত নিহত হয়। মাত্র একজন নবী, যিনি জীবরাঈল (আঃ)-এর নিকট হইতে ইলহাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি এই সংবাদ দিয়াছিলেন যে, সম্রাটের পরাজয় অত্যন্ত শোচনীয় ধরনের হইবে এবং সে নিহত হইবে ও কুকুরে তাহার মাংস খাইবে। এই সংবাদ সত্য সাব্যস্ত হইল। কিন্তু চারিশত নবীর ইলহাম মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল।

এখানে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে যে, এত অধিক পরিমাণে যখন শয়তানী ইলহামও হইয়া থাকে, তখন ইলহামের উপর হইতেই তো বিশ্বাস উঠিয়া যায়। এরূপ হইলে ওহী ইলহাম নির্ভরের অযোগ্য হইয়া পড়ে। কেননা ইহা শয়তানী (ইলহাম)ও হইতে পারে। বিশেষ করিয়া যখন হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর ন্যায় একজন দৃঢ় প্রত্যয়ী নবীও এরূপ ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছেন, তখন ইলহামের অধিকারীগণের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া পড়ে। এরূপ হইলে তো ইলহাম বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে, নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। দুনিয়াতে খোদাতাআলার ইহাই চিরন্তন নিয়ম যে, প্রত্যেক খাঁটি জিনিষেরই নকল হইয়া থাকে। যেমন একপ্রকার মুক্তা আছে যাহা সমুদ্র হইতে আহরণ করা হয়। আবার মানুষের নির্মিত স্বল্পমূল্যের মুক্তাও বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে নকল মুক্তা আছে বলিয়া আসল মুক্তার ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হইতে পারে না। খোদাতাআলা যেসব জহুরীকে চক্ষু দিয়াছেন, তাহারা এক দৃষ্টিতেই আসল-নকল চিনিয়া ফেলে। সেইরূপ ইলহামী মণিমানিক্যের জহুরী হইতেছেন যুগ-ইমাম। তাঁহার সংস্পর্শে থাকিয়াই মানুষ তরিৎ স্বপ্নের সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করিতে সক্ষম হয়।

হে সুফী! হে মোহান্ধ ব্যক্তি! কিছু হুশিয়ার হইয়া এ পথে পা বাড়াও, এবং বিশেষভাবে স্মরণ রাখিও যে, সত্য ইলহাম, যাহা খোদাতাআলার পক্ষ হইতেই হইয়া থাকে, তাহাতে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে :-

(১) মানুষের হৃদয় যখন বেদনার দহনে বিগলিত হইয়া নির্মল জলের

ন্যায় খোদার দিকে প্রবহমান হয়, তখনই ইহা (ইলহাম) হইয়া থাকে। হাদীস শরীফে ইহারই প্রতি ইঙ্গিত আছে, কুরআন বিষাদের অবস্থায় অবতীর্ণ হইয়াছে, অতএব তোমরাও ইহাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পাঠ কর।

(২) সত্য ইলহাম এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি ও আনন্দ আনয়ন করে এবং অজানা কারণে (হৃদয়ে) দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়। উহা লৌহ শলাকার (কোষ্ঠে প্রবিষ্ট হওয়ার) ন্যায় হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। উহার ভাষা প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত হইয়া থাকে।

(৩) সত্য ইলহামে এক মহৎ শক্তি এবং সমৃদ্ধি বিদ্যমান থাকে। ইহাতে হৃদয়ে প্রচন্ড ধাক্কা লাগে, এবং প্রতাপপূর্ণ ও গম্ভীর আওয়াজে উহা হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু মিথ্যা ইলহামে চোর, নপুংসক এবং স্ত্রীলোকগণের ন্যায় মিহি সুর থাকে, যেহেতু শয়তান স্বয়ং চোর, নপুংসক এবং (অবলা) নারীতুল্য।

(৪) সত্য ইলহামে খোদাতাআলার ক্ষমতাবলীর প্রভাব নিহিত থাকে। উহাতে অবশ্যই ভবিষ্যদ্বাণী থাকিবে এবং তাহা পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

(৫) সত্য ইলহাম মানুষকে উত্তরোত্তর পবিত্র করিয়া তোলে এবং তাহার অভ্যন্তরীণ মলিনতা ও অপবিত্রতা দূর করিয়া নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটায়।

(৬) মানুষের সমস্ত অভ্যন্তরীণ শক্তি সত্য ইলহামের সত্যতার সাক্ষী হইয়া যায়। তাহার প্রত্যেক শক্তির উপর এক প্রকার নতুন ও পবিত্র আলোকসম্পাত হইয়া থাকে। ফলে মানুষ নিজের মধ্যে এক অভিনব পরিবর্তন অনুভব করে। তাহার অতীত জীবনের মৃত্যু ঘটে এবং নব জীবনের সূচনা হয় এবং সে মানব জাতির সকলের জন্য সহানুভূতির অবলম্বনস্বরূপ হইয়া যায়।

(৭) সত্য ইলহাম একটিই আওয়াজে শেষ হইয়া যায় না, কেননা খোদার বাণীতে ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। তিনি পরম দয়ালু। যাহার দিকে শুভ দৃষ্টি দান করেন, তাহার সহিত তিনি কথোপকথন করেন এবং তাহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন। একই জায়গায় এবং একই সময়ে মানুষ তাহার

আবেদনের জবাব পাইতে পারে। অবশ্য এই কথোপকথনের ধারার মধ্যে কোন কোন সময়ে বিরামও দেখা দেয়।

(৮) সত্য ইলহাম-প্রাপ্ত মানুষ কখনও কাপুরুষ হয় না। তিনি ইলহামের কোন দাবীকারকের মোকাবেলায় সে তাঁহার ঘোর বিরোধী হউক না কেন, তিনি তাহাকে ভয় পান না। তিনি জানেন, খোদা তাঁহার সঙ্গে আছেন এবং তিনি ঐ ব্যক্তিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিবেন।

(৯) সত্য ইলহাম প্রচুর জ্ঞান ও তত্ত্ব আহরণের উপায় স্বরূপ হয়। কেননা, খোদা তাঁহার বাণীপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অজ্ঞ এবং মূর্খ রাখিতে চাহেন না।

(১০) সত্য ইলহামের সহিত আরও বহু কল্যাণ জড়িত থাকে। আল্লাহ্‌র বাণীপ্রাপ্ত পুরুষ অজ্ঞাতভাবে নানা সম্মানে ভূষিত হন এবং তাঁহাকে প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করা হয়।

ইহা এমন এক বক্র যুগ যে, অধিকাংশ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং ব্রাহ্মসমাজী এই ইলহাম অস্বীকার করে। এই অস্বীকারের অবস্থায়ই অনেকেই এই পথিবী হইতে গত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, সমগ্র জগৎ সমর্থন না করিলেও, সত্য-সত্যই থাকিবে এবং সমস্ত দুনিয়া সমর্থনকারী হইলেও মিথ্যা মিথ্যাই থাকিবে।

যাহারা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখে এবং তাঁহাকে সমগ্র জগতের নিয়ন্তা বলিয়া মানে এবং তাঁহাকে সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী বলিয়া জানে, তাহাদের এক অদ্ভুত মূর্খতা এই যে, এরূপ স্বীকারোক্তির পরও খোদাতাআলার বাণীকে অস্বীকার করে। যিনি সব দেখিতে ও শুনিতে পান এবং কোন বস্তুর সাহায্য ব্যতিরেকে যিনি প্রতি অণু-পরমাণুর উপর আধিপত্য রাখেন, তিনি কি কথা বলিতে পারেন না? আর একথা বলা তো ভুল যে, পূর্বে (তাঁহার বাকশক্তি) ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সেই শক্তি লোপ পাইয়া গিয়াছে, যেন তাঁহার সিফ্‌তে কালাম (বাকশক্তি) ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সেই শক্তি লোপ পাইয়া গিয়াছে, যেন তাঁহার, বাক্‌শক্তি অতীতে ছিল, বর্তমানে নাই। ইহা এক অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ধারণা। যদি খোদাতাআলার গুণসমূহও কিছুদিন যাবৎ কার্যকরী থাকিয়া অচল হইয়া যায় এবং চিহ্নমাত্র

বর্তমান না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার অপর শক্তিগুলি সম্বন্ধেও সন্দেহের উদ্রেক হয়। আফসোস, এরূপ বুদ্ধি এবং বিশ্বাসের উপর যে, আল্লাহ্‌র সমস্ত গুণে বিশ্বাসী হইয়া পুনরায় (মানুষ স্বয়ং) ছুরিকা হস্তে উহাদের মধ্যে হইতে একটি প্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আর্যগণ তো খোদাতাআলার বাণীকে বেদেই সীমাবদ্ধ রাখিয়া মোহর মারিয়া দিয়াছিল। খৃষ্টানগণও প্রত্যাদেশের উপর মোহর লাগাইতে ছাড়ে নাই। তাহাদের কথা মত হযরত মসীহ্ (আঃ) পর্যন্তই যেন মানুষের দিব্য-দৃষ্টি ও তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিবার জন্য জ্বলন্ত প্রত্যাদেশের প্রয়োজন ছিল এবং পরবর্তী বংশধরগণ এরূপ হতভাগ্য যে, তাহারা এই সৌভাগ্য হইতে চির বঞ্চিত রহিয়া গেল। অথচ, সকল যুগেই মানবের জন্য প্রত্যক্ষ নিদর্শন এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রহিয়াছে। ধর্ম কেবল ততদিন পর্যন্ত জ্ঞানের আলোকে থাকিতে পারে, যতদিন খোদার শক্তির, নবনব বিকাশ প্রকাশমান থাকে। অন্যথায়, কেচ্ছা-কাহিনী সর্বস্ব হইয়া উহা শীঘ্রই নিষ্প্রাণ হইয়া যায়।

এইরূপ ব্যর্থতা কি মানুষের বিবেক কখনও স্বীকার করিতে পারে? যখন আমরা স্বীয় অন্তরেই একথা অনুভব করি যে, আমরা এরূপ পূর্ণ-তত্ত্ব লাভের পিয়াসী যাহা খোদাতাআলার বাণী ও বড় বড় নিদর্শন ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই অর্জন করা সম্ভবপর নহে, তখন ইহা কি সম্ভব যে, খোদাতাআলার দয়া আমাদের উপর তাঁহার বাণীর দ্বার রুদ্ধ করিতে পারেন? কেন, বর্তমান যুগে কি আমাদের হৃদয় বদলাইয়া গিয়াছে অথবা খোদা বদলাইয়া গিয়াছেন?

আমরা তো ইহা মানি এবং স্বীকারও করি যে, কোনও সময়ে এক ব্যক্তির প্রত্যাদেশবাণী লক্ষ মানবের তত্ত্ব-জ্ঞানকে সঞ্জীবিত করিতে পারে আর প্রত্যেকের নিকট (ইলহাম) হওয়া প্রয়োজনীয় নহে, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে, প্রত্যাদেশের অস্তিত্বকেই উড়াইয়া দেওয়া হউক এবং আমাদের হাতে কেবল এরূপ কতকগুলি কাহিনী সম্বল থাকিয়া যাউক যাহা আমরা কেহই স্বচক্ষে দেখি নাই।

প্রকাশ থাকে যে, কোন বিষয় শত শত বর্ষ ব্যাপিয়া যদি শুধু গল্পের আকারেই চলিতে থাকে এবং উহার সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোন তাজা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে দর্শন প্রভাবিত মানব মন উহা কোন

শক্তিশালী প্রমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করিতে রাজী হইবে না, বিশেষ করিয়া সেই গল্পের মধ্যে যখন এরূপ কথা থাকে, যাহা বর্তমান যুগে যুক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই কারণেই কিছুকাল পর দার্শনিক ভাবাপন্ন মানব, সর্বদা নিদর্শন সম্বন্ধে ঠাট্টা-বিদ্রুপ আরম্ভ করিয়া দেয়, এমনকি এগুলিকে সন্দেহের সীমায়ও স্থান দিতে চাহে না। এরূপ করিবার অবশ্য তাহাদের অধিকারও আছে। কারণ তাহারা ভাবে যে, যখন সেই খোদা-ই আছেন এবং তাঁহার গুণাবলীও অপরিবর্তনীয় এবং আমাদের প্রয়োজনীয়তাও পূর্ববৎ রহিয়াছে, তখন আবার প্রত্যাদেশের ধারা কেন বন্ধ রহিয়াছে। কেননা, প্রত্যেক মানব হৃদয় তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, তাহারাও নিত্য নব তত্ত্বজ্ঞান লাভের মুখাপেক্ষী। এই জন্যই হিন্দুগণের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি নাস্তিক হইয়া গিয়াছে, কারণ পন্ডিতগণ তাহাদিগকে বারবার এই শিক্ষাই দিয়া আসিয়াছেন যে, কোটি কোটি বৎসর হইতে প্রত্যাদেশের (ইলহামের) ধারা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইজন্য এখন তাহাদের অন্তরে সন্দেহ জাগিয়াছে যে, বেদের যুগের তুলনায় যখন বর্তমান যুগে প্রত্যাদেশের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী, তখন প্রত্যাদেশ সত্য ব্যাপার হইয়া থাকিলে বেদের পরে ইহার ধারা কেন কায়েম রহিল না? এই জন্যই আর্য ভারতে নাস্তিকতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইজন্যই হিন্দুদের মধ্যে অনেক শাখা আছে, যাহারা এই কারণে বেদের নাম শুনিলে ব্যঙ্গ করে এবং উহাতে আস্থাবান নহে, তাই তাহাদের মধ্যে জৈন মতাবলম্বী নামে একটি সম্প্রদায় বিদ্যমান।

প্রকৃত প্রস্তাবে শিখগণও এই মতবাদের কারণে হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। কেননা একেতো হিন্দু ধর্মে পৃথিবীর সহস্র সহস্র বস্তুকে খোদার অংশীদার করা হইয়াছে এবং ইহা অংশীবাদিতার এরূপ একটি বিশাল স্তুপ, যাহার মধ্যে পরমেশ্বরের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

আবার বেদের ইলহামী হওয়ার যে দাবী, ইহা একটি প্রমাণবিহীন গল্প মাত্র, যাহার সত্যতা সম্বন্ধে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বের উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়া থাকে কিন্তু কোন তাজা প্রমাণ নাই। তাই, যে প্রকৃত শিখ সে বেদে বিশ্বাস রাখে না। উদাহরণস্বরূপ ১৮৯৮ ইং সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের লাহোরের উর্দু "আখবার আম" পত্রিকায় জনৈক শিখ ভদ্রলোকের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহাতে তিনি ইহাই সাব্যস্ত করিয়াছেন যে,খালসা

সম্প্রদায় বেদ মানে না এবং তাহাদের গুরুর আদেশ, কেহ যেন কোনক্রমে বেদে বিশ্বাস স্থাপন না করে। তিনি গ্রন্থসাহেব-এর (তাহাদের ধর্মীয় শাস্ত্র) শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহার সারমর্ম এই যে, "বেদ কখনও মান্য করিও না।" তিনি স্বীকার করিয়াছেন শিখগণ আদৌ বেদের অনুসরণ করে না এবং উহা তাঁহারা আদৌ বিশ্বাস করেন না। অবশ্য তিনি কুরআন শরীফের অনুসরণেরও স্বীকৃতি দেন নাই। ইহার কারণ এই যে, শিখগণ ইসলাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং সেই আলোক সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে বে-খবর যাহা সর্বশক্তিমান চিরঞ্জীব খোদা ইসলামে নিহিত রাখিয়াছেন, এবং অজ্ঞতা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হওয়ার কারণে কুরআন শরীফে যে অফুরন্ত আলোর ভান্ডার রহিয়াছে উহার সন্ধান পর্যন্ত তাহারা জানে না। বস্তুতঃ সামাজিকভাবে হিন্দুদিগের সহিত তাহাদের যে সম্পর্ক আছে মুসলমানগণের সহিত তাহা নাই। নতুবা তাহাদের জন্য ইহা যথেষ্ট হইত, যদি তাহারা সেই উপদেশাবলীর দ্বারা পরিচালিত হইত যাহা বাবা নানক তাঁহার 'চোলা'* সাহেবের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কারণ চোলা সাহেবের উপর বাবা নানক ইহাই লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইসলাম ব্যতিরেকে আর কোন সঠিক এবং সত্য ধর্ম নাই। অতএব এমন সাধুজনের এরূপ জরুরী উপদেশ উপেক্ষা করা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। খালসা (শিখ) সাহেবগণের হাতে শুধু এক চোলা সাহেবই রহিয়াছে, যাহা বাবা নানকের হস্তের স্মৃতিচিহ্ন। গ্রন্থের শ্লোকগুলি তো বহু পরে সংগৃহীত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানীগণের অনেক কিছু বলিবার আছে। খোদাই জানেন উহার মধ্যে কত রদবদল হইয়াছে এবং উহাতে কোন্ কোন্ লোকের প্রক্ষিপ্ত কথা রহিয়াছে। যাহা হউক ইহা এই কাহিনী বলার পরিবেশ নহে। আমার বলিবার প্রকৃত উদ্দেশ্যতো এই যে, মানবজাতির ঈমানকে সজীব রাখিবার জন্য নিত্য নব ইলহামের সর্বদা প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রভাব-বিস্তারী শক্তি দ্বারা ঐ ইলহামকে সনাক্ত করা যায়; কেননা খোদা ছাড়া কোন শয়তান, জীন্ এবং ভূতের প্রভাব-বিস্তারী শক্তি নাই। যুগ-ইমামের ইলহামের দর্পণে অবশিষ্ট ইলহামের স্বরূপ যাচাই করা হয়।

* 'চোলা- সাহেব' বাবা নানকের পরিধেয় জামা যাহা পরিধান করিয়া তিনি হজ্জ করিয়াছিলেন এবং যাহার উপর কলেমা ও কুরআনের আয়াতসমূহ লিখিত ছিল- প্রকাশক

আমি ইতঃপূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, যুগ-ইমাম আপন প্রকৃতির মধ্যে নেতৃত্বের শক্তি ধারণ করেন। আল্লাহ্‌তাআলার শক্তিশালী হস্তে তাঁহার মধ্যে নেতৃত্বের স্বভাব সৃষ্টি করা হয়ে থাকে এবং ইহা আল্লাহ্‌র এক বিধান যে, তিনি মানব জাতিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখিতে চাহেন না। বরং যেরূপ তিনি সৌরজগতে অনেক তারকাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সূর্যকে এই জগতের অধিপতি করিয়া দিয়াছেন, তদ্রুপ তিনি সাধারণ বিশ্বাসীগণকে মর্যাদা অনুযায়ী তারকারাশির ন্যায় আলোক দান করিয়া যুগ-ইমামকে তাহাদের সূর্যরূপে আখ্যা দিয়াছেন। ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান। এমনকি তাঁহার সৃষ্টির বিধানে ইহা দৃষ্টিগোচর হয় যে, মধুমক্ষিকার মধ্যেও অনুরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাদের মধ্যেও একজন নেত্রী থাকে যাহাকে মক্ষিকারানী বলা হয়। জড় জগতেও আল্লাহ্‌তাআলা ইচ্ছা করিয়াছেন যে, প্রত্যেক জাতিতে একজন আমীর বা শাসক থাকিবেন।

যাহারা বিচ্ছেদ পসন্দ করে এবং এক নেতার শাসনাধীনে চলে না, তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ। অথচ আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বলিয়াছেন :

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

[অর্থাৎ 'আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা অধিকারপ্রাপ্ত তাহাদেরও' (সূরা নিসা 4 ঃ 60)।

اُولِى الْاَمْرِ 'আদেশ দিবার' অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলিতে জাগতিক দিক দিয়া শাসনকর্তা এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়া যুগ-ইমামকে বুঝায়। জাগতিকভাবে যে ব্যক্তি আমাদের উদ্দেশ্যাবলীর বিরোধী নয় এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাহার কাছ হইতে আমাদের উপকার লাভ হইতে পারে, সে আমাদের মধ্যে গণ্য। তাই আমার জামাতের প্রতি আমার উপদেশ ইহাই যে, **ইংরেজদের শাসনকে*** উলীল আমরের মধ্যে গণ্য করিবে এবং খাঁটিভাবে তাহাদের অনুগত থাকিবে, কেননা তাহারা আমাদের ধর্মীয় উদ্দেশ্যের পথে ব্যাঘাত ঘটায় না বরং তাহাদের পক্ষ হইতে আমরা অনেক স্বস্তি লাভ করিয়াছি। ইহা আমার বিশ্বাসঘাতকতা হইবে, যদি স্বীকার না করি যে, ইংরেজগণ এক দিক

* তৎকালে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল এবং মুসলমানগণ জাতি হিসাবে সেই শাসন মানিয়া লইয়াছিল -প্রকাশক

দিয়া আমাদের ধর্মের এরূপ সাহায্য করিয়াছে যে, ভারতবর্ষের মুসলমান শাসকগণেরও সেই সামর্থ্য হয় নাই। ভারতবর্ষের কোন কোন মুসলমান শাসক ভীরুতা প্রদর্শন করিয়া পাঞ্জাব প্রদেশ ত্যাগ করিয়াছিল এবং তাহাদের এই অবহেলার জন্য শিখদের বিভিন্ন শাসনামলে আমাদের এবং আমাদের ধর্মের উপর এরূপ বিপদাবলী আপতিত হইয়াছিল যে, মসজিদে জামাত করিয়া নামায পড়া এবং উচ্চঃস্বরে আযান দেওয়াও দুঃসাধ্য ছিল। পাঞ্জাবে ইসলাম ধর্ম লোপ পাইয়াছিল। এমনি সময়ে ইংরাজগণ আসিল। আমাদের ভাগ্য ফিরিল। তাহারা ইসলাম ধর্মের সাহায্য করিল এবং ধর্ম পালনের ব্যাপারে আমাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিল, আমাদের মসজিদগুলি আমাদিগকে ফিরাইয়া দিল এবং দীর্ঘকাল পরে আবার পাঞ্জাবে ইসলামের রীতি-নীতি দৃশ্যমান হইতে লাগিল।

এই উপকার কি ভুলিবার মত? বরং সত্য কথা বলিতে কি, কতক দুর্বল প্রকৃতির মুসলমান শাসক নিজেদের অবহেলার দ্বারা আমাদিগকে 'কুফর-স্থানে' ফেলিয়া দিয়াছিল এবং ইংরাজগণ হস্ত ধারণ করিয়া আমাদিগকে ইহা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিল। অতএব ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের তাল পাকানোর অর্থ হইল, খোদাতাআলার দানকে ভুলিয়া যাওয়া।

পুনরায় মূল বিষয়ে ফিরিয়া আসিয়া বলিতেছি যে, কুরআন শরীফ পার্থিব সমাজব্যবস্থার বিষয়ে শাসকের আদেশ পালন করিবার জন্য যেরূপ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে, তদ্রুপ তাগিদ আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার ব্যাপারেও রহিয়াছে। এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ্‌তাআলা এই দোয়া শিক্ষা দিতেছেন ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

[অর্থাৎ "আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে চালাও-তাঁহাদের পথে, যাঁহাদিগকে তুমি পুরস্কার দান করিয়াছ" (সূরা ফাতিহা 1 ঃ 6-7)] অতএব চিন্তা করা উচিত যে, এমনিতে তো কোন বিশ্বাসী বরং কোন সাধারণ মানব বা জীব-জন্তুও খোদাতাআলার দান হইতে বঞ্চিত নহে, কিন্তু ইহা কেহ বলিতে পারিবে না যে, উহাদিগের অনুসরণের জন্যও খোদাতাআলা এই আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং উক্ত আয়াতের প্রকৃত অর্থ এই, যাঁহাদের উপর পরম ও

চরম আধ্যাত্মিক পুরস্কার বর্ষিত হইয়াছে, আমাদিগকে তাঁহাদের পথে চলিবার এবং তাঁহাদের অনুগমন করিবার শক্তি দাও। অতএব এই আয়াতে এই ইঙ্গিতই রহিয়াছে যে, তুমি যুগ-ইমামের অনুগামী হও।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, 'যুগ-ইমাম', শব্দটিতে নবী, রসূল, মুহাদ্দাস (যাঁহাদের সাথে আল্লাহ্ বাক্যালাপ করেন) ও মুজাদ্দিদ সকলেই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি মানবজাতির সংশোধন এবং পথ প্রদর্শনের জন্য আদিষ্ট হন নাই এবং তদুপযোগী কামালাত বা উৎকর্ষও প্রদত্ত হন নাই, তাহারা ওলী বা আবদাল হইলেও 'যুগ-ইমাম' হইতে পারেন না।

শেষ প্রশ্ন ইহাই রহিয়া গিয়াছে যে, বর্তমান যামানার ইমাম কে, যাঁহার অনুসরণ করা সাধারণ মুসলমান, সাধক, সত্যস্বপ্ন-দর্শী এবং ওহী ইলহাম-প্রাপ্তগণের জন্য আল্লাহ্তাআলা কর্তৃক অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে? এ কথার উত্তরে আমি দ্বিধাহীন চিত্তে বলিতেছি যে, খোদাতাআলার অনুগ্রহ ও দয়ায় **'সেই যুগ-ইমাম আমি।'** খোদাতাআলা আমার মধ্যে যাবতীয় শর্ত এবং নিদর্শন একত্রিত করিয়া দিয়াছেন এবং বর্তমান * শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন যাহা হইতে পনের বৎসর ** অতীতও হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে আমি আবির্ভূত হইয়াছি যখন ইসলামী আকীদাসমূহ (ধর্ম-বিশ্বাস) মত-বিরোধে ভরিয়া গিয়াছে এবং কোন বিশ্বাসই মতভেদশূন্য ছিল না।

অনুরূপভাবে মসীহ্ (আঃ)-এর 'নুযূল' (আবির্ভাব) সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহাতে এরূপ মত-পার্থক্য ছিল যে, কেহ হযরত ঈসা (আঃ) কে জীবিত বলিয়া মনে করিত, কেহ মৃত বলিয়া ভাবিত, কেহ তাঁহার সশরীরে অবতরণে বিশ্বাস করিত, কাহারও বিশ্বাস ছিল তিনি আধ্যাত্মিকভাবে অবতীর্ণ হইবেন, কেহ তাঁহাকে নামাইতেছিলেন দামেস্কে, কেহ মক্কায়, কেহ বায়তুল মোকাদ্দাসে এবং কেহ ইসলামী সৈন্যদলে। আবার কেহ ইহা ভাবিত যে, তিনি ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইবেন। সুতরাং এইরূপ পরস্পর বিরোধী মত ও উক্তিগুলি একজন হাকাম বা বিচারকের

* হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী-প্রকাশক।

** এখন হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দী শুরু হইয়া গিয়াছে- প্রকাশক।

প্রতীক্ষায় ছিল। আর সেই বিচারক আমি। আমি আধ্যাত্মিকভাবে ক্রুশ ধ্বংস করিবার জন্য এবং সকল মতভেদ দূর করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।

উল্লিখিত দুইটি কারণে আমার আগমনের প্রয়োজন হইয়াছে। আমার সত্যতার সমর্থনে আর কোন প্রমাণ উপস্থিত করা আমার জন্য প্রয়োজন ছিল না, কেননা প্রয়োজন নিজেই বলিষ্ঠ প্রমাণ। কিন্তু তবু খোদা আমার সত্যতার স্বপক্ষে অনেক নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন।

আমি যেরূপ অপরাপর সকল বিতর্কের মীমাংসার জন্য হাকাম বা বিচারক, তদ্রুপ (মসীহ্ সম্পর্কে) জীবিত ও মৃতের বিতর্কের ব্যাপারেও আমি বিচারক। মসীহ্ (আঃ)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম ইবনে হাযাম (রহঃ) এবং মু'তাযিলার বক্তব্যকে আমি সঠিক বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছি এবং আহলে সুন্নত জামাতের অপর সকলকে ভ্রান্তিতে নিপতিত বলিয়া আমি মনে করি। বিচারক হিসাবে আমি বিরোধকারীগণের প্রতি এই আদেশ দান করিতেছি যে, 'নুযূল' বা অবতরণ সম্বন্ধে আহলে সুন্নতের এই দলটি রূপক অর্থের ক্ষেত্রে সত্য, কেননা মসীহ্র আধ্যাত্মিক প্রতিবিম্বস্বরূপ অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যকীয় ছিল। একথা ঠিক যে, নুযুলের ব্যাখ্যা করিতে তাহারা ভুল করিয়াছে।

অবতরণ বরূযী (গুণগত) অর্থে ছিল, বাহ্যিক ও দৈহিক অবতরণ অর্থে নহে। মসীহ্র মৃত্যু সম্বন্ধে মু'তাযিলা, ইমাম মালেক ও ইমাম ইবনে হাযাম প্রমুখ সকলে একমত এবং ইহাই প্রকৃত কথা, কারণ কুরআন শরীফের স্পষ্ট আয়াত-অর্থাৎ ঃ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي অনুযায়ী খৃষ্টানগণের পথভ্রান্ত হওয়ার পূর্বে মসীহ্ (আঃ)-এর মৃত্যু ঘটা আবশ্যক ছিল। বিচারক হিসাবে এ সম্বন্ধে ইহা আমার সিদ্ধান্ত। এখন যে ব্যক্তি আমার সিদ্ধান্তকে অমান্য করিবে, বস্তুতঃ সে তাঁহাকেই অমান্য করিবে, যিনি আমাকে বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন।

যদি কেহ এই প্রশ্ন করে যে, তোমার বিচারক হওয়ার প্রমাণ কী? ইহার উত্তর এই, যে যুগে বিচারকের আগমন নির্ধারিত ছিল সেই যুগ বর্তমান, যে জাতির ক্রুশ সম্বন্ধীয় ভুল সংশোধন করা বিচারকের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেই জাতিও বিদ্যমান এবং যে সকল নিদর্শন সাক্ষীস্বরূপ এই বিচারকের

জন্য নির্ধারিত ছিল তাহাও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে এবং এখনও নিদর্শনের ধারা প্রবহমান। আকাশ নিদর্শন দেখাইতেছে, পৃথিবী নিদর্শন প্রকাশ করিতেছে। ভাগ্যবান সেইসব ব্যক্তি, যাহাদের চক্ষু এখন বন্ধ থাকে না।

আমি ইহা বলি না যে, পূর্ববর্তী নিদর্শনগুলি দিয়াই আমার উপর বিশ্বাস আনয়ন কর। বরং আমি বলি যে, আমি যদি বিচারক না হই, তাহা হইলে আমার নিদর্শনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া দেখ। যেহেতু মানবজাতির আকীদার (ধর্মীয়-বিশ্বাস) মধ্যে ভ্রান্তি বিস্তারের সময় আমি বিচারক হিসাবে আগমন করিয়াছি, সেইজন্য আমার বিরুদ্ধে অন্যান্য বিষয়ের বিতর্ক অচল, কেবল আমার হাকাম হওয়ার বিষয়ে প্রত্যেকের বিতর্ক করার অধিকার রহিয়াছে যাহা আমি সকলই সম্পাদন করিয়াছি।

খোদাতাআলা আমাকে চারিটি নিদর্শন দিয়াছেন ঃ

(১) কুরআন শরীফের অলৌকিকত্বের প্রতিচ্ছায়ায় আমি আরবী ভাষায় বাগ্মিতা ও রচনা-শক্তির উৎকর্ষ প্রদত্ত হইয়াছি। এমন কেহ নাই, যে এই বিষয়ে আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

(২) আমি কুরআন শরীফের হাকীকত অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও মা'রেফত (গভীর তত্ত্ব-জ্ঞান) প্রকাশ করিবার নিদর্শন প্রদত্ত হইয়াছি। এমন কেহ নাই, যে এই বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

(৩) আমি অসংখ্য দোয়া কবুলীয়তের নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতেও কেহ আমার সমকক্ষতা করিতে সক্ষম নহে। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমার ত্রিশ হাজারেরও অধিক প্রার্থনা কবুল হইয়াছে এবং ইহার প্রমাণও আমার নিকট রহিয়াছে।

(৪) আমাকে গায়েবের (অদৃশ্যের) সংবাদের নিদর্শন প্রদত্ত হইয়াছে। এমন কেহ নাই, যে এই ব্যাপারে আমার মোকাবেলা করিতে সক্ষম হয়। খোদাতাআলার এই সাক্ষ্যগুলি আমার নিকট রহিয়াছে এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ উজ্জ্বল নিদর্শনের ন্যায় আমার স্বপক্ষে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

آسماں بارد نشان الوقت مے گوید زمیں این دو شاہد از پئے تصدیق من استادہ اند*

* আকাশ নিদর্শনের ধারা বর্ষণ করিতেছে, পৃথিবীও 'সময় হইয়াছে' বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছে। এই দুই সাক্ষী আমার সত্যতার স্বপক্ষে দন্ডায়মান হইয়াছে।-অনুবাদক

অনেক দিন হইল যখন রমযান মাসে চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল, হজ্জ্ বন্ধ হইয়াছিল এবং হাদীসের উক্তি অনুযায়ী দেশে প্লেগেরও প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। আমার মাধ্যমে বহু নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে, শত শত হিন্দু এবং মুসলমান উহাদের সাক্ষী, যেগুলির কথা আমি উল্লেখ করি নাই। এই সব কারণে আমি যুগ- ইমাম। খোদা আমার সাহায্যকারী এবং তিনি আমার পক্ষে তীক্ষ্নধার অসির ন্যায় দন্ডায়মান আছেন। আমাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে- যে কেহ আমার বিরুদ্ধে দুষ্ট অভিপ্রায় লইয়া দন্ডায়মান হইবে, সে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত হইবে।

দেখ, আমি সেই আদেশ তোমাদের নিকটে পৌঁছাইয়া দিলাম যাহার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত ছিল। এতদ্সংক্রান্ত সকল কথা আমি আমার পুস্তকাদিতে ইতঃপূর্বে বহুবার লিখিয়াছি। কিন্তু যে ঘটনাটি আমাকে এই বিষয়ে লিখিতে বারবার তাগিদ দিতেছিল তাহা হইতেছে আমার এক বন্ধুর স্বকীয় ধারণা প্রসূত ভ্রান্ত-বিশ্বাস। উহার সংবাদ পাইয়া আমি এই পুস্তিকাখানা অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে লিখিতেছি। উক্ত ঘটনার বিবরণ এইরূপ ঃ

কিছুদিন আগে অর্থাৎ ১৮৯৮ সালের সেপ্টেম্বর তথা হিজরী ১৩১৬ সালের জমাদিউল আওয়াল মাসে আমার এক বন্ধু, যাহাকে আমি সজ্জন, সাধু, ধর্মভীরু ও পরহেযগার বলিয়া জানি এবং পূর্ব হইতেও যাহার সম্বন্ধে আমার খুব ভাল ধারণা ছিল, وَاللّٰهُ حَسِيْبُهٗ (আল্লাহ্ই তাহার প্রকৃত হিসাব-নিকাশকারী), কিন্তু কতকগুলি ধারণায় তাহাকে আমি ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি এবং এই ভ্রান্তির কুফলের জন্য তাহার পরিণাম সম্বন্ধে আমি দুশ্চিন্তায় আছি। তিনি আমার অন্য এক প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে কষ্ট স্বীকার করিয়া কাদিয়ানে আমার নিকট আসেন এবং তাহার অনেকগুলি ইলহাম আমাকে শুনান। ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম যে, আল্লাহ্তাআলা তাহাকেও ইলহাম প্রাপ্তির সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহার ইলহামগুলি বর্ণনাকালে আমাকে তাহার একটি এরূপ স্বপ্নও শুনাইয়াছিলেন যাহাতে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'কেন আমি আপনার বয়াত করিব? পক্ষান্তরে আপনারই উচিত আমার নিকট বয়াত করা'। এই স্বপ্ন দ্বারা আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি আমাকে মসীহ্ মওউদ বলিয়া স্বীকার করেন না অধিকন্তু ঐশী ইমামত সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই সহানুভূতি প্রণোদিত হইয়া ঐশী ইমামত এবং

বয়াতের তাৎপর্য সম্বন্ধে এই পুস্তিকাটি রচনা করিতে মনস্থ করিলাম।

অতএব, সত্য ইমাম যাঁহার বয়াত লইবার অধিকার আছে সেই সম্বন্ধে আমি এই পুস্তিকায় অনেক কিছু লিখিয়াছি। এখন বয়াতের গূঢ় উদ্দেশ্য বর্ণনা বাকী রহিয়াছে। 'বয়আত' بيعت শব্দটি بيع 'বায়উন' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'বায়উন' সেই দিপাক্ষিক চুক্তিকে বলে, যদ্বারা একে অপরকে কোন দ্রব্য অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে দিয়া থাকে। সুতরাং বয়াতের তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি বয়াত করে, সে আপন সত্তাকে তাহার সমস্ত অধিকারসহ একজন পথ-প্রদর্শকের হস্তে এই উদ্দেশ্যে বিক্রয় করিয়া দেয়। যাহার বিনিময়ে সে ঐ পূর্ণ-তত্ত্ব ও কল্যাণ লাভে সক্ষম হয়, যাহাতে তত্ত্ব-জ্ঞান, নাজাত এবং আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টি লাভ ঘটে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বয়াতের অর্থ শুধু তওবা করা নহে, কারণ সেরূপ তওবাতো মানুষ নিজে নিজেও করিতে পারে। বরং ইহার উদ্দেশ্য সেই তত্ত্ব-জ্ঞান, কল্যাণ ও নিদর্শন লাভকে বুঝায় যাহা (মানুষকে) প্রকৃত তওবার দিকে আকর্ষণ করে।

বয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ আপন সত্তাকে পথ-প্রদর্শকের গোলামীতে (আনুগত্যে) নিয়োজিত করিয়া ইহার বিনিময়ে সেই জ্ঞান, তত্ত্ব ও কল্যাণ লাভ করে যদ্বারা ঈমান সুদৃঢ় হয় ও তত্ত্ব-জ্ঞান-বৃদ্ধি ঘটে এবং আল্লাহ্তাআলার সহিত এক অনাবিল সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এইরূপে পার্থিব জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পারলৌকিক নরক হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় এবং পার্থিব দৃষ্টিহীনতা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া আখেরাতের দৃষ্টিহীনতা হইতেও নিরাপদ হয়। সুতরাং এই বয়াতের ফল বা পুরস্কার দান করিবার জন্য যদি কোন সিদ্ধ পুরুষ বিদ্যমান থাকেন অথচ কেহ যদি জানিয়া-শুনিয়া তাঁহাকে এড়াইয়া চলে, তাহা হইলে ইহা হইবে দুষ্টামীর পরাকাষ্ঠার নামান্তর।

হে আমার প্রিয় বন্ধু! অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ঐশী তত্ত্ব-জ্ঞান ও কল্যাণের জন্য আমি এমন ক্ষুধাতুর ও পিয়াসী যে, এক সমুদ্র পান করিয়াও আমার তৃপ্তি হইবে না। যদি কেহ আমাকে তাহার গোলামীতে বরণ করিতে চাহে তবে ইহা অতি সহজ পন্থা যে, বয়াতের তাৎপর্য এবং ইহার আসল দর্শনকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে যেন আমার সহিত এই ক্রয়বিক্রয় করিয়া নেয়। যদি তাহার নিকট এইরূপ অকাট্য যুক্তি প্রমাণ ঐশী তত্ত্ব-জ্ঞান ও আশিস ও

কল্যাণ থাকে যাহা আমি প্রাপ্ত হই নাই এবং ঐ কুরআনী-তত্ত্ব তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকে, যাহা আমার নিকট হয় নাই, তবে বিসমিল্লাহ্!--সেই বুযূর্গকে আমি আমার গোলামী এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার দিতে প্রস্তুত। তিনি আমাকে সেই আধ্যাত্মিক মা'রেফত, কুরআনের তত্ত্ব-জ্ঞান এবং ঐশী আশিস দান করুন! আমি বেশী কষ্ট দিতে চাহি না। আমার ঐশীবাণী-প্রাপ্ত বন্ধুবর কোন এক মজলিসে শুধু সূরা ইখলাসের তত্ত্বাবলী ব্যাখ্যা করুন। আমি যদি তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ উত্তম ব্যাখ্যা দিতে না পারি, তাহা হইলে আমি তাহার আনুগত্য স্বীকার করিব।

ندارد کسے باتو ناگفتہ کار ولیکن چوگفتی دلیلش بیار*

যাহা হউক, আপনার নিকট যদি এরূপ মারেফাত, তত্ত্ব-জ্ঞান ও আশিস থাকে যাহাতে অলৌকিকতার প্রভাব বিদ্যমান, তাহা হইলে শুধু আমি কেন, আমার সমস্ত জামাত আপনার নিকট বয়াত করিবে। ইহা যে না করিবে সে অতি দুষ্ট। আমি আর কী বলিব এবং কী লিখিব? আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি যখন আপনার লিখিত ইলহামগুলি শুনিয়াছিলাম, ঐগুলিতেও অনেক স্থানে শব্দতত্ত্ব ও পদবিন্যাসের ব্যাকরণগত ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না, আমি কেবল সৎ উদ্দেশ্যে এবং বিনীতভাবে ধর্মোপদেশ হিসাবে ইহা বলিলাম। পক্ষান্তরে যদি কোন অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ব্যক্তির ইলহামের মধ্যে কোন ব্যাকরণঘটিত ত্রুটি থাকিয়া যায় তাহা হইলে আমার মতে, ইলহামের মৌলিক সত্তা সম্বন্ধে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না।

ইহা একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম মসলা যাহার বিশদ বাখ্যার প্রয়োজন, কিন্তু এখানে ইহার সুযোগ নাই। যদি এইরূপ ত্রুটি দেখিয়া কোন নিরস মোল্লা আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে-ও ক্ষমার্হ কেননা আধ্যাত্মিক দর্শনের অঙ্গণে তাহার প্রবেশ লাভ হয় নাই। পরন্তু ইহা নিম্ন শ্রেণীর ইলহাম যাহা খোদাতাআলার পূর্ণ জ্যোতির প্রভাবে রঙিন হইয়া উঠে নাই। কারণ ইলহাম তিন পর্যায়ের হইয়া থাকে যথা, নিম্ন, মধ্যম এবং উচ্চ।

* যতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবে, ততক্ষণ কেহ তোমাকে কিছু বলিবে না, কিন্তু যখনই কিছু উচ্চারণ করিবে তখনই তাহার প্রমাণ দিতে হইবে।- অনুবাদক

যাহা হউক, এই সকল ত্রুটি দেখিয়া আমাকে লজ্জিত হইতে হইয়াছিল এবং আপন মনে দোয়া করিতেছিলাম,আমার বন্ধু যেন এই সমস্ত ইলহাম যাহা বাহ্যতঃ আপত্তিজনক, কোন দুষ্ট প্রকৃতির নিরস মোল্লাকে না শুনান যাহাতে সে অনর্থক ঠাট্টা- বিদ্রুপ করিবে। যে ইলহাম মারেফাত ও তত্ত্ব-জ্ঞান শূন্য, উহা স্বপক্ষ বা বিপক্ষ কাহারও কোন কাজে আসে না, বিশেষ করিয়া বর্তমান যুগে; বরং ইহাতে উপকারের পরিবর্তে অপকারের আশঙ্কা আছে। আমি ঈমান ও সত্যতার হলফ করিয়া বলিতেছি যে, একথা সম্পূর্ণরূপে সত্য। আমার প্রিয় বন্ধুটি যেন আল্লাহ্‌র প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করেন, কারণ ইহাতে যে পরিমাণে অন্তরের পবিত্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, সেই অনুপাতে ইলহামে ভাষার প্রাঞ্জলতা বাড়িতে থাকিবে *। পবিত্র কুরআনের ওহী অপর সকল নবীর ওহী হইতে মা'রেফত বা তত্ত্ব-জ্ঞান ছাড়াও ভাষার লালিত্য, বাগ্মিতা এবং প্রাঞ্জলতায়ও উৎকৃষ্টতর, কারণ আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে সর্বাপেক্ষা অধিক অন্তরের পবিত্রতা দান করা হইয়াছিল। এ কারণেই মর্মের দিক দিয়া তত্ত্ব-জ্ঞানে এবং ভাষার দিক দিয়া লালিত্য ও বাগ্মিতায় তাঁহার (সাঃ) ওহীর প্রকাশ ঘটিয়াছে।

আমার বন্ধু ইহাও যেন স্মরণ রাখেন যে, বয়াত এক ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপার, যাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার বিজ্ঞ বন্ধু মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব ওয়াজ করিবার সময় কুরআন শরীফের যেরূপ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও মা'রেফত বা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, উহার সহস্রাংশের একাংশও আমার প্রিয় বন্ধুটির মুখ হইতে নিঃসৃত হইবে বলিয়া আদৌ আশা করি না। ইহার কারণ, ইলহামী অবস্থার অপরিপক্কতা এবং সাধনার পথ সম্পূর্ণ পরিহার। জানি না আজিও কোন তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট হইতে তাঁহার কুরআন শুনিবারও সৌভাগ্য হইয়াছে কি না? **

---

* আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই বিশিষ্ট বন্ধুটি যদি অতিরিক্ত মনসংযোগ করেন, তাহা হইলে শীঘ্রই তাহার ইলহামে কামালিয়ত বা পরিপূর্ণতা আসিবে।

** আমি অস্বীকার করি না যে, আধ্যাত্মিক (লাদুন্নী) জ্ঞানের উৎস আপনার জন্য উন্মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু এখনও তাহার সময় হয় নাই। স্বপ্ন এবং দিব্য-দর্শনের মধ্যে রূপক এবং উপমার প্রাধান্য থাকে। কিন্তু আপনি আপনার স্বপ্নের স্থূল অর্থ

খোদার ওয়াস্তে, আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। আপনি এখনও বয়াতের তাৎপর্য বুঝেন নাই যে, ইহাতে কি আদান প্রদান হয়। আমার জামাতে আমার হস্তে বয়াতকারী আল্লাহ্‌র দাসগণের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছেন যিনি মর্যাদাশীল জ্ঞানী। তাঁহার নাম মৌলবী হাকীম হাফিয হাজীউল হারামাইন নূরুদ্দীন সাহেব। মনে হয় যেন তিনি সারা দুনিয়ার তফসীর নিজের আয়ত্তে রাখেন। তেমনি তাঁহার হৃদয় কুরআনের অজস্র তত্ত্বজ্ঞানের ভান্ডারস্বরূপ। যদি সত্য সত্যই আপনাকে এখন বয়াত গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে কুরআনের একটি মাত্র পারা এবং উহার তত্ত্ব-জ্ঞান ব্যাখ্যাসহ তাঁহাকে পড়াইয়া দিন। এই লোকগুলিতো উম্মাদ নহেন যে, অপর মুলহামগণকে ছাড়িয়া আমার হস্তেই বয়াত করিবেন। আপনি যদি হযরত মৌলবী সাহেবের অনুবর্তিতা করিতেন, তাহা হইলে আপনার জন্য মঙ্গল হইত। আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন, উক্ত জ্ঞানবান ব্যক্তিত্ব যিনি আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিয়া পর্ণ-কুটীরে কষ্টে বাস করিতেছেন, তিনি কি আমার মধ্যে কোন কিছু না দেখিয়াই এরূপ কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছেন? ইলহাম লাভে সম্মানিত আমার বন্ধুটি যেন স্মরণ রাখেন যে, তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। যদি তিনি আপন ইলহামী শক্তিতে উল্লেখিত মৌলবী সাহেবকে কুরআনের জ্ঞান সম্বন্ধে নমুনা দেখাইতে পারেন এবং এইরূপ অসাধারণ ক্রিয়ার আলোক-প্রভায় নুরুদ্দীনের ন্যায় কুরআনের অনুরাগী ব্যক্তিকে শিষ্য করিতে পারেন তাহা হইলে আমি এবং আমার জামাত আপনার জন্য আত্মোৎসর্গ করিব। কতকগুলি অস্পষ্ট ইলহাম সম্বল করিয়া যাহার অধিকাংশই ভ্রান্তিপূর্ণ, কোন ব্যক্তি কি কখনও নিজেকে যুগ-ইমাম বলিয়া ভাবিতে পারে? বন্ধুবর! যুগ-ইমাম হওয়া বহু শর্ত-সাপেক্ষ, তবেই তো সে সমগ্র পৃথিবীর মোকাবেলা করিতে সক্ষম হইবে।

করিয়াছেন। মোজাদ্দেদ সাহেব সরহিন্দী একটি কাশ্‌ফ (দিব্য-দর্শন) দেখিয়াছিলেন যে, তাহার কল্যাণে হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম খলীলুল্লাহ্‌র মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য কথা যে, শাহ অলিউল্লাহ সাহেব দেখিয়াছিলেন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহ্ আলায়হে ওয়াসাল্লাম যেন তাহার হস্তে বয়াত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানের গভীরতাবশতঃ আপনার ন্যায় উহাদের স্থূল অর্থ গ্রহণ করেন নাই, বরং মর্মার্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

ہزار نکتۂ باریک تر ز مو اینجاست نہ ہر کہ سر بتراشد قلندری داند *

আমার প্রিয় মুলহাম বন্ধুর নিকট সচরাচর ইলহামী বাক্যাবলী অবতীর্ণ হয় বলিয়া যেন ধোঁকায় পতিত না হন। আমি যথার্থই বলিতেছি, আমার জামাতে এরূপ ইলহামপ্রাপ্ত এমনও লোক রহিয়াছেন যে, কাহারও কাহারও ইলহামের সমষ্টিতে একটি পুস্তক হইয়া যাইবে। সৈয়দ আমীর আলী শাহ্ প্রতি সপ্তাহান্তে এক পাতা কাগজে তাঁহার ইলহামগুলি লিখিয়া পাঠান। কতিপয় মহিলা আমার এই কথার সাক্ষী, যাহারা আরবীর একটি অক্ষরও পাঠ করেন নাই অথচ তাহারাও আরবীতে ইলহাম পাইয়া থাকেন। আমি বিস্মিত হই যে, তাহাদের ইলহামে আপনার তুলনায় ভুল-ভ্রান্তি কম থাকে।

গত ১৮৯৮ এর ২৮ শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাহাদের একজনের কতকগুলি ইলহাম তাহার আপন ভ্রাতা ফতেহ্ মোহাম্মদ বযদারের নিকট হইতে আমি পত্রের মারফত প্রাপ্ত হইয়াছি। এই প্রকারের ইলহামের অধিকারী আমার জামাতে অনেক আছেন। এই শ্রেণীর একজন লাহোরে আছেন। কিন্তু এইরূপ ইলহাম লাভের কারণে কি কেহ যুগ ইমামের বয়াত উপেক্ষা করিতে পারে? কাহারও নিকট বয়াত করিতে তো আমার কোন আপত্তি নাই। বয়াতের উদ্দেশ্য হইতেছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি। এখন আপনি বলুন, বয়াত দ্বারা আমাকে আপনি কী জ্ঞান শিক্ষা দিবেন এবং কুরআনের কোন্ তত্ত্ব কথা শুনাইবেন! আপনি আসুন এবং ইমামতের প্রকাশ জৌলুস দেখান, আমরা সকলেই বয়াত করিব।

حضرتِ ناصح گر آئیں دیدہ و دل فرش راہ پر کوئی مجھ کو تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا **

আমি ঢাকের নিনাদে ঘোষণা করিতেছি যে, খোদা আমাকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহার সবই ইমামতের নিদর্শনস্বরূপ দিয়াছেন। যে ব্যক্তি

* কেশ অপেক্ষা সূক্ষ্ম সহস্র তত্ত্ব ইহাতে আছে। যে কেহ মস্তক মুন্ডন করে, সে-ই সাধক হয় না।- অনুবাদক

** মাননীয় উপদেষ্টা যদি আসেন, তাহা হইলে তাহার জন্য চক্ষু এবং হৃদয় পাতিয়া দিব কিন্তু আমাকে কেহ বুঝাইয়া দিন যে, তিনি আমাকে কী বুঝাইবেন।- অনুবাদক

এরূপ ইমামতের নিদর্শন দেখাইবে এবং প্রমাণ করিবে যে, মর্যাদায় সে আমার উপর শ্রেষ্ঠতর তাহা হইলে আমি তাহার নিকট বয়াতের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতে প্রস্তুত। কিন্তু খোদার প্রতিশ্রুতি কখনও টলে না। তাঁহার মোকাবেলা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে 'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থে এই ইলহামটি লিপিবদ্ধ হইয়াছে ঃ

الرحمٰن علّم القرآن۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم ولتستبين سبيل المجرمين قل انی امرت وانا اول المومنين۔

অর্থাৎ পরম করুণাময়, অযাচিত অসীম দানকারী যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়াছেন যেন তুমি সেই জাতিকে সতর্ক কর যাহাদের পিতৃপুরুষগণকে (ইতঃপূর্বে) সতর্ক করা হয় নাই এবং যাহাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হইয়া যায়। তুমি বল, 'আমি আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমি মুমিনদের প্রথম'।

এই ইলহাম অনুযায়ী খোদা আমাকে কুরআনের জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং আমার নাম 'প্রথম মু'মিন' রাখিয়াছেন। তিনি আমাকে সমুদ্রের ন্যায় মা'রেফত এবং তত্ত্ব-জ্ঞানে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। এবং বার বার ইলহামযোগে আমাকে জানাইয়াছেন যে, বর্তমান যুগে ঐশী-জ্ঞান, ঐশী-প্রেম ও তত্ত্ব-জ্ঞানে আমার সমকক্ষ আর কেহ নাই। আমি খোদার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি মল্লযুদ্ধের ময়দানে দন্ডায়মান। যে কেহ আমাকে গ্রহণ না করিবে অবিলম্বে মৃত্যুর পরে সে লজ্জিত হইবে। আর, এখন সে আল্লাহ্‌র অকাট্য যুক্তির নীচে দন্ডায়মান।

বন্ধুগণ! পার্থিব বা ধর্মীয় কোন কাজই যোগ্যতা ব্যতিরেকে সাধিত হয় না। আমার স্মরণ আছে, এক ইংরেজ বিচারকের সম্মুখে সম্ভ্রান্ত বংশীয় এক ব্যক্তিকে তহশীলদারী চাকুরীর জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি একেবারে অশিক্ষিত ছিল, এমন কি উর্দু পর্যন্ত জানিত না। ঐ ইংরেজটি বলিলেন, "আমি যদি তাহাকে তহশীলদার নিযুক্ত করি তাহা হইলে তাহার স্থলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবে কে? আমি তাহাকে পাঁচ টাকার বেশী বেতনের চাকুরী দিতে অক্ষম। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌তাআলাও বলিয়াছেনঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ

[অর্থাৎ- "আল্লাহ্‌তাআলা জানেন রেসালত কোথায় ন্যস্ত করিতে হইবে" (সূরা আন্‌'আম 6 ঃ 125)],

নবুওয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যাঁহার সমক্ষে সহস্র সহস্র শত্রু-মিত্র প্রশ্ন এবং আপত্তি লইয়া উপস্থিত হয়, তাঁহার কি এতটুকুই মর্যাদা যে, কয়েকটি মাত্র ইলহামী শব্দ তাঁহার সম্বল হইবে এবং তাহাও প্রমাণবিহীন; আপন ও বিরোধী জাতির সকলেই কি ইহার দ্বারা স্বস্তি লাভ করিতে পারিবে?

এখন আমি এই প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। যদি ইহাতে কোন শক্ত কথা বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি প্রত্যেক পাঠক এবং আমার মুলহাম বন্ধুটির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি কেবল সৎ উদ্দেশ্যে কয়েক ছত্র লিখিলাম। আমার এই বন্ধুকে আমি মনেপ্রাণে ভালবাসি এবং প্রার্থনা করি যেন খোদা তাঁহার সহায় হন।

ইতি
খাকসার
মির্যা গোলাম আহমদ
কাদিয়ান; জেলা-গুরদাসপুর

এক বন্ধুর নামে মৌঃ আব্দুল করীম সাহেব (রাঃ)-এর পত্র *

بسم الله الرحمٰن الرحيم. الحمد لوليه والصلوٰة والسلام على نبيه

আব্দুল করীমের পক্ষ হইতে আমার ভাই ও আমার প্রিয় নাসরুল্লাহ খাঁর প্রতি আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আজ আমার অন্তরে পুনরায় এক প্রেরণার সৃষ্টি হইয়াছে, যেন আপনাকে কিছু মনোবেদনার কাহিনী শুনাই। সম্ভবতঃ আপনি আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হইবেন। দীর্ঘকাল পরের (আমার) এই প্রেরণা বৃথা যাইবে না। হৃদয়ের পরিচালক কখনও আপন বান্দাগণকে নিরর্থক কাজে উদ্বুদ্ধ করেন না। চৌধুরী সাহেব! আমিও আদম সন্তান। দুর্বল নারীর গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। আমার মধ্যেও মানব-সুলভ দুর্বলতা, সম্পর্কের প্রতি আসক্তি এবং অপারগতা থাকা নিশ্চয়ই সম্ভব। এই দুর্বল নারীর গর্ভজাত কেহ বিপাকে না পড়িলে সে পাষাণ হৃদয় হইতে পারে না। আমার একান্ত কোমল হৃদয় চিররোগিণী বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিত আছেন। আমার পিতাও জীবিত আছেন। (হে আল্লাহ্! তুমি তাঁহাকে এবং তাঁহার বংশধরকে ক্ষমা কর, তুমি তাঁহাকে উত্তম কাজ করিবার তওফীক দান কর)। আমার পরম প্রিয় ভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও রহিয়াছেন। তবুও যে আমি এখানে সন্ন্যাসীর ন্যায় মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতেছি, সে কি আমার কঠিন হৃদয়ের জন্য? অথবা আমি কি উন্মাদ, না আমার বুদ্ধি বিকার ঘটিয়াছে? তবে কি আমি অন্ধ পূজারীদের অনুসারী এবং তত্ত্ব-জ্ঞানশূন্য? অথবা আমি অসৎ জীবন যাপনকারী হিসাবে আপন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও শহরবাসীর নিকট পরিচিত? অথবা আমি কি পেটের দায়ে বহুরূপীর ন্যায় নিত্য নূতন বেশ বদলাইতেছি?

يعلم الله والملائكة يشهدون

* এই পত্রটির প্রতি সহসা আমার নজর পড়িয়া যায়, যাহা আমার ভ্রাতা মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন। আমার লিখিত পুস্তিকার সহিত ইহার সম্পর্ক থাকার কারণে আমি ইহাকে ছাপাইয়া দিলাম-গ্রন্থকার ।

(অর্থাৎ "আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ এবং ফিরিশতাগণ সাক্ষী যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে আমি ঐ সকল দোষ হইতে মুক্ত)।

وَلَا أُزَكِّيْ نَفْسِيْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ

(অর্থাৎ "আমি নিজকে পবিত্ররূপে দেখাইতে চাহি না, কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করিয়া থাকেন")।

তবে সে বস্তু কী, যাহা আমার মধ্যে এইরূপ দৃঢ়তার সৃষ্টি করিয়াছে এবং যাহা সকল সম্বন্ধের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে? এক কথায় ইহার পরিষ্কার উত্তর এই যে, ইহা **যুগ-ইমামের পরিচয় লাভ**।

আল্লাহ্ আল্লাহ্! একি ব্যাপার? ইহার মধ্যে এমন বিরাট ঐশী শক্তি নিহিত যাহা সকল শৃঙ্খলকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেয়! আপনি উত্তমরূপে জানেন যে, আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ্তাআলার কিতাবের রহস্য ও তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকারী এবং আপন গৃহে আল্লাহ্র কিতাব পাঠ ও শিক্ষাদান ব্যতিরেকে আমার আত্মা বা আমার নিজের তৃপ্তির জন্য কি যথেষ্ট ছিল না? কখনও নয়। আল্লাহ্র কসম, পুনরায় বলিতেছি আল্লাহ্র কসম, কখনও নয়।

আমি স্বয়ং কুরআন পাঠ করিতাম এবং অপরকে শুনাইতাম, জুমুআর দিন মিম্বরে দাঁড়াইয়া নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে অতি প্রভাববিস্তারী বক্তৃতা দিতাম, আল্লাহ্র আযাব সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করিতাম এবং নিষিদ্ধ কাজ করিতে নিষেধ করিতাম। কিন্তু আমার আত্মা ভিতরে ভিতরে আমাকে সর্বদা তিরষ্কার করিত যে,

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

("কেন তোমরা বল, যাহা তোমরা কর না? ইহা আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত ঘৃণার্হ যে, তোমরা উহা বল, যাহা কর না") (সূরা সাফ্ফ 61 ঃ 3-4)। আমি অন্যকে কাঁদাইতাম অথচ নিজে কাঁদিতাম না। অপরকে অন্যায় ও মন্দ কাজ হইতে বিরত করিয়াছি, কিন্তু নিজে বিরত হই নাই। যেহেতু আমি সত্যি সত্যিই ভন্ড, স্বার্থপর ও প্রতারক ছিলাম না এবং পার্থিব সম্মান এবং মর্যাদা লাভ আমার লক্ষ্য ছিল না, সেই জন্যই কিছুক্ষণ একাকী থাকিলেই আমার

মনে উক্ত কথাগুলি ভীড় জমাইত। কিন্তু যেহেতু আত্ম-সংশোধনের জন্য কোন পথের সন্ধান পাইতাম না এবং ঈমান এইরূপ মিথ্যা, নিরস ক্রিয়াকর্ম জিনিসে সন্তুষ্ট থাকিতেও অনুমতি দেয় না, অবশেষে এই দোটানায় আমি হৃদয়ের দুর্বলতার কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলাম। অনেকবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, পড়াশুনা ও শিক্ষাদান একেবারে ছাড়িয়া দিব; কিন্তু আবার নূতন উদ্যমে নীতি, আধ্যাত্মিকতা ও তফসীরের পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিতাম। 'এহইয়ায়ে উলুম,' 'আওয়ারেফুল মা'রেফ' 'ফুতুহাতে মক্কীয়া' চার খন্ড এবং বহু পুস্তক মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলাম। কুরআন করীমতো আমার আত্মার খোরাক ছিল। আলহামদুলিল্লাহ্, এখনও তাহাই আছে। জ্ঞানান্মেষের পূর্বেই বাল্যকাল হইতেই এই পবিত্র ও মহিমান্বিত কিতাবের প্রতি আমার এরূপ অনুরাগ যে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না।

বস্তুতঃ জ্ঞানতো বাড়িয়া গেল এবং মজলিসকে আনন্দ দিতে সাজাইয়া গোছাইয়া বক্তৃতা করিবার জন্য অনেক উপাদানও লাভ হইল, এবং আমি দেখিয়াছি যে, বহু রোগী আমার দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমার নিজের মধ্যে কোন পরিবর্তন হইতেছিল না। পরিশেষে অনেক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পর, আমার নিকট ইহা উন্মোচিত হইল যে, জিন্দা নমুনা অথবা সেই জীবনের উৎসে পৌঁছা ব্যতীত, যাহা অন্তরের অপবিত্রতাকে ধৌত করিতে পারে, এই কালিমা দূর হইবে না। কামেল (পূর্ণ) পথ-প্রদর্শক খাতামুল আম্বিয়া সালাওয়াতুল্লাহে ওয়াসাল্লামু কীরূপভাবে তেইশ বৎসরের মধ্যে সাহাবাগণকে সদাচার ও নৈতিকতার স্তরগুলি অতিক্রম করাইয়াছিলেন! কুরআন ছিল জ্ঞানের ভান্ডার এবং তিনি (সাঃ) ছিলেন উহার প্রকৃত ব্যবহারিক আদর্শ। শুধু শব্দ ও জ্ঞানের প্রভাব কুরআনের আদেশসমুহের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যকে অসাধারণভাবে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে নাই, বরং হুযুর পাক (সাঃ)-এর মহান আদর্শ, তুলনাহীন চরিত্র ও অন্যান্য ঐশী সাহায্যের সংযোগ এবং অবিরাম বিকাশ, তাঁহার অনুসরণকারীদের হৃদয়ে স্থায়ী মোহর অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল।

যেহেতু আল্লাহ্তাআলার নিকট ইসলাম অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনি ইসলামকে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাখা স্থির করিয়াছেন, সেই জন্য তিনি ইহা পসন্দ করেন নাই যে, পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের ন্যায় এই ধর্মও গল্প ও কেস্সা কাহিনীর রঙ ধারণ করিয়া অকেজো হইয়া যায়। এই পবিত্র ধর্মে

সকল যুগেই জীবন্ত আদর্শ বিদ্যমান ছিল, যাঁহারা জ্ঞান এবং কর্মের দ্বারা কুরআন আনয়নকারী আলায়হে সালাওয়াতুর রহমানের যুগ মানুষকে স্মরণ করাইয়াছেন। এই নিয়মানুসারে আমাদের যুগেও আল্লাহ্‌তাআলা সাক্ষী হিসাবে আমাদের মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-কে প্রেরণ করিয়াছেন। এই পত্রে আমি যাহা কিছু লিখিতে চাহিয়াছি, তাহা হইল হযরত আকদস ইমামে সাদেক আলায়হেস্ সালামের পবিত্র সত্তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কতিপয় ঈমান উদ্দীপক প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত। ইতোমধ্যে হযরত আকদস (আঃ) কতিপয় কারণে ইমামের প্রয়োজনীয়তা (জরুরতুল ইমাম) সম্বন্ধে গত পরশু নিজেই একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন, যাহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তাই বাধ্য হইয়া আমি আমার এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম।

পরিশেষে আমি আপনাকে আপনার পবিত্র সাহচর্য ও সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া নিয়মিত কেতাবুল্লাহর দরসে উপস্থিতি, আপনার সম্বন্ধে ভাল অভিমত এবং এই সব বিষয়ে আপনার পুণ্য-আত্মা ও পবিত্র কথা স্মরণ করাইয়া আপনার উজ্জ্বল বিবেক ও পবিত্র সত্তার নিকট বিনীত নিবেদন জানাইতেছি যে, আপনি চিন্তা করুন, সময় খুবই সংকটপূর্ণ। সেই জিন্দা ঈমান, যাহা কুরআন দাবী করে এবং পাপকে ধ্বংস করিবার যে অগ্নি অন্তরে সঞ্চার করিতে চাহে, তাহা কোথায়? আমি মহান আরশের অধিপতি, খোদার শপথ করিয়া আপনাকে নিশ্চয়তা দিতেছি যে, সেই ঈমান, হযরত নায়েবে-রসূল মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর হাতে হাত মিলানোর ফলে এবং তাঁহার পবিত্র সাহচর্যে থাকার ফলে লাভ করা যায়।

এখন এই উত্তম কার্যে বিলম্ব করাতে আমার ভয় হইতেছে যে, আপনার অন্তরে না কোন আশংকাজনক পরিবর্তন আসিয়া যায়। পৃথিবীর ভয়কে পরিত্যাগ করুন এবং আল্লাহ্‌তাআলার জন্য সমস্ত কিছু বিসর্জন দিন, নিশ্চয় সব কিছু পাইবেন।

ওয়াস্‌সালাম,
(কাদিয়ান হইতে)

বিনীত
আবদুল করীম
১লা অক্টোবর,১৮৯৮ইং

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

ইনকাম ট্যাক্স এবং তাজা নিদর্শন

صدق را ہر دم مدد آید ز ربّ العٰلمین

صادقاں را دستِ حق باشد نہاں در آستیں

ہر بلا کز آسماں بر صادقے آید فرود

آخرش گردد نشانے از برائے طالبیں *

ডঃ ক্লার্কের মোকদ্দমায় আমার কতিপয় অজ্ঞ দুশমন বিফল হওয়ায় বড়ই দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়াছিল। কেননা তাহাদের চেষ্টা-তদ্বির সত্ত্বেও তাহাদিগকে এমন এক মোকদ্দমায় প্রকাশ্য পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল যাহা এই লেখকের প্রাণ এবং সম্মানের উপর এক আঘাত ছিল। তাহাদিগকে কেবল যে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল তাহাই নহে, বরং এই মোকদ্দমা সংক্রান্ত সেই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হইল, যে সম্বন্ধে দুই শতেরও অধিক বিশিষ্ট এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জানানো হইয়াছিল এবং সর্বসাধারণের মধ্যে পূর্ব হইতেই যথাযথভাবে প্রচার করা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল বিরুদ্ধবাদীকে তাহাদের কুধারণা ও তাড়াহুড়ার জন্য আরও এক পরাজয় বরণ করিতে হয়। তাহা এই, ইদানীং আদালতের আইনানুযায়ী তদন্ত ছাড়াই যখন গ্রন্থাকারের নিকট সরাসরিভাবে অর্থাৎ, ১৮৭.৫০ টাকা ইনকাম ট্যাক্স ধার্য করিয়া দাবী করা হইল তখন এই সকল লোক, যাহাদের নাম লিখিবার

* বিশ্ব-প্রতিপালকের তরফ হইতে সত্যের প্রতি সদা সাহায্য আসে। সত্যবাদীর আস্তীনের মধ্যে খোদার সাহায্যের হাত গোপন থাকে। প্রত্যেক ঐ বিপদ যাহা আকাশ হইতে সত্যবাদীর উপর নামিয়া আসে, পরিণামে সত্যান্বেষীর জন্য নিদর্শনে পরিণত হয়।-অনুবাদক

প্রয়োজন নাই, (বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজেই বুঝিতে পারিবেন) মনে মনে খুবই আনন্দিত হইয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল যে, যদিও আমাদের প্রথম চেষ্টা বিফল হইয়াছে তবু ইহা আমাদের সৌভাগ্য যে, এখন এই মোকদ্দমায় উহার ক্ষতিপূরণ হইবে। কিন্তু অসৎ উদ্দেশ্যপরায়ণ এবং আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি কখনও সফলতা লাভ করিতে পারে না। কারণ ষড়যন্ত্র ও শঠতা দ্বারা বিজয়ী হওয়া যায় না। একজন আছেন, যিনি মানুষের অন্তঃকরণ দেখেন, তাহার অভ্যন্তরীণ চিন্তাগুলিকে পরীক্ষা করেন এবং তাহার নিয়ম অনুযায়ী আকাশ হইতে আদেশ অবতীর্ণ করেন। সুতরাং তিনি এই বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এই আশাও পুরণ হইতে দিলেন না। অবশেষে পূর্ণ তদন্তের পর ১৮৯৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইনকামট্যাক্স রহিত হইয়া যায়।

একযোগে এই দুইটি মোকদ্দমা চলার মধ্যে ইহাতেও এক ঐশী উদ্দেশ্য নিহিত ছিল যাহাতে আমার মান, ইজ্জত ও মাল সম্বন্ধে অর্থাৎ তিন দিক দিয়া এবং তিনভাবে খোদাতাআলার সাহায্য বর্তমান থাকা সাব্যস্ত হয়। কেননা ডঃ ক্লার্কের মোকদ্দমায়তো প্রাণ ও ইজ্জত সম্বন্ধে ঐশী সাহায্য প্রমাণের সীমায় পৌঁছিয়াছিল। মাল সম্বন্ধে সাহায্যের প্রকাশ তখনও গোপন ছিল। সুতরাং খোদা আপন অপার অনুগ্রহে চাহিলেন যে, জনসাধারণকে আমার মাল সম্বন্ধেও তাঁহার সাহায্য দেখাইবেন। অতএব, তিনি এই সাহায্যও প্রকাশ করিয়া তিন প্রকার সাহায্যের পরিসীমাকে পূর্ণ করিয়া দিলেন। এই মোকদ্দমা দায়ের হওয়ার মধ্যে এই রহস্যই নিহিত ছিল।

ডঃ ক্লার্কের মোকদ্দমা খোদাতাআলার তরফ হইতে এই জন্য দাঁড় করানো হয় নাই যে, আমাকে বিনষ্ট বা লাঞ্ছিত করা হইবে, বরং এইজন্য করা হইয়াছিল যেন সর্বশক্তিমান এবং দয়ালু খোদার নিদর্শন প্রকাশিত হয় এবং এই ক্ষেত্রে তাহাই হইল।

যেভাবে আমার খোদা, জান ও ইজ্জতের মোকদ্দমা সম্বন্ধে ইলহাম দ্বারা পূর্ব হইতে আমাকে শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন যে, পরিণামে আমি মুক্তি লাভ করিব এবং দুশমন লাঞ্ছিত হইবে, তেমনি তিনি এই মোকদ্দমা সম্বন্ধেও পূর্ব হইতে আমাকে শুভ সংবাদ দিয়াছিলেন যে, পরিণামে আমি বিজয়ী হইব এবং অসৎ ও বিদ্বেষপরায়ণ শত্রু বিফল হইবে। তদনুযায়ী সেই ইলহামী

সুসংবাদ, চুড়ান্ত রায় বাহির হইবার পূর্বেই আমাদের জামাতের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচার লাভ হইয়াছিল। আমাদের জামাত যেভাবে জান ও ইজ্জতের মোকদ্দমায় এক আসমানী নিদর্শন দেখিয়াছিল, সেইভাবে এই মোকদ্দমাতেও তাহারা এক ঐশী নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিল যাহা তাহাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হইল। ইহার জন্য সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তাআলার।

আমি বড়ই অবাক হইয়া যাই যে, একের পর এক নিদর্শন প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে। তথাপি সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্য মৌলভীগণের মনোযোগ নাই। তাহারা ইহাও দেখে না যে, খোদাতাআলা তাহাদিগকে প্রত্যেক ময়দানে পরাজয় দিতেছেন, অথচ তাহারা বড়ই আগ্রহের সহিত কামনা করিতেছেন যে,আল্লাহ্‌র যে কোন প্রকারের সাহায্য তাহাদের ক্ষেত্রেও প্রমাণিত হউক। কিন্তু সাহায্য তো দূরের কথা দিন দিন তাহাদের ভাগ্যে লাঞ্ছনা ও বিফলতা প্রমাণিত হইতেছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ যখন পঞ্জিকার বর্ণনা অনুযায়ী একথা প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল যে, এই রমযানে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হইবে এবং মানুষের মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে, ইহা প্রতিশ্রুত ইমামের প্রকাশিত হইবার লক্ষণ, তখন মৌলভীগণের হৃদকম্পন উপস্থিত হইল, কারণ-মাহদী এবং মসীহ্ হইবার একমাত্র দাবীদার একমাত্র এই ব্যক্তিই ময়দানে দন্ডায়মান আছেন, এমন না হয় যে, জনসাধারণ তাঁহারই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

তখন ঐ নিদর্শনকে চাপা দিবার জন্য প্রথমে কেহ কেহ এই কথা বলিতে আরম্ভ করিল যে, এই রমযানে কিছুতেই সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হইবে না বরং যখন ইমাম মাহদী আবির্ভূত হইবেন তখন ইহা ঘটিবে। যখন রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গেল তখন তাহারা আপত্তি তুলিল যে, এই সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণ হাদীসের শব্দ অনুযায়ী ঘটে নাই। কারণ হাদীসে আছে প্রথম রাত্রে চন্দ্রগ্রহণ এবং মধ্যের তারিখে সূর্যগ্রহণ হইবে। কিন্তু এই চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণে ১৩ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮ তারিখে সূর্যগ্রহণ হইয়াছে। যখন তাহাদিগকে বুঝানো হইল যে, হাদীসে মাসের ১লা তারিখের কথা বলা হয় নাই, কারণ প্রথম তারিখের চাঁদকে 'কমর' বলা হয় না, উহার নামতো 'হেলাল', অথচ হাদীসে 'কমর' শব্দ আছে, 'হেলাল' নয় এবং তদনুসারে

হাদীসের অর্থ হইল যে, চন্দ্রগ্রহণের রাত্রিগুলির মধ্যে প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ লাগিবে, অর্থাৎ মাসের ১৩ তারিখের রাত্রিতে এবং মধ্যবর্তী দিনে সূর্যগ্রহণ লাগিবে, অর্থাৎ সূর্যগ্রহণের দিনগুলির মধ্যে মধ্যবর্তী দিনে (অর্থাৎ ২৮শে তারিখে) সূর্যে গ্রহণ লাগিবে। *

ইহাতে অজ্ঞ মৌলভীগণ হাদীসের এই সঠিক ব্যাখ্যা শুনিয়া লজ্জিত হইল। পরে তাহারা বহু পরিশ্রম করিয়া দ্বিতীয় আপত্তি বাহির করিল যে, হাদীসের বর্ণনাকারীগণের মধ্যে একজন বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। তখন তাহাদিগকে বলা হইল, হাদীসে নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গেলে, সত্য ঘটনার মোকাবেলায় যাহা হাদীসের সত্যতার জন্য এক মজবুত দলিলস্বরূপ, সেক্ষেত্রে সন্দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত আপত্তি সম্পূর্ণ মূল্যহীন, অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা যখন সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইহা সত্যবাদীর বাণী, তখন তাহাকে সত্যবাদী না বলিয়া মিথ্যাবাদী বলা, সত্য ঘটনার অস্বীকারের নামান্তর মাত্র। সব সময়ই মোহাদ্দিসগণের নীতি ইহাই যে, সন্দেহ কখনও বাস্তবকে রহিত করিতে পারে না। এই ভবিষ্যদ্বাণীটির তাৎপর্য অনুযায়ী মাহদী হইবার একজন দাবীদারের যুগে পূর্ণ হইয়া যাওয়া, এই কথার নিশ্চিত সাক্ষ্য যে, যাঁহার মুখ হইতে উহা নিঃসৃত হইয়াছে, তিনি (সঃ) সত্য বলিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে বর্ণনাকারীর (রাবী) সম্পর্কে ইহা বলা যে, তাঁহার চালচলন সম্বন্ধে বক্তব্য আছে, ইহা এক সন্দেহের কথা। কখনও কখনও মিথ্যাবাদীও সত্য বলিয়া থাকে।

ইহা ছাড়া এই ভবিষ্যদ্বাণী আর একভাবে সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। হানাফীগণের কয়েকজন বড় বড় বুযুর্গও ইহা লিখিয়াছেন, তথাপি অস্বীকার করা ন্যায়পরায়ণতার কাজ নহে বরং ইহা সরাসরি হঠকারিতা। এইরূপ

* প্রকৃতির নিয়ম এই যে, চন্দ্রগ্রহণের জন্য মাসের তিনটি রাত্রি নির্দিষ্ট আছে অর্থাৎ ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ তারিখ এবং চিরকাল চন্দ্রগ্রহণ এই তিন রাত্রির মধ্যে যে কোন এক রাত্রিতে ঘটিয়া থাকে। এই হিসাবে চন্দ্র গ্রহণের প্রথম রাত্রি হইল ১৩ই তারিখের রাত্রি। উপরোক্ত হাদীসটি এই বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে। চান্দ্র মাসের ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখে সূর্যগ্রহণ হয়। সুতরাং এই হিসাবে সূর্যগ্রহণের মধ্যবর্তী দিন ২৮ তারিখ হয় এবং এই তারিখগুলিতেই গ্রহণ লাগিয়াছে।

দাঁতভাঙ্গা জবাবের পর, তাহারা বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই হাদীস ঠিক এবং ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, শীঘ্র প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী আবির্ভূত হইবেন। তবে এই ব্যক্তি প্রতিশ্রুত ইমাম নহে; বরং তিনি অন্য ব্যক্তি যিনি ইহার পর শীঘ্রই আবির্ভূত হইবেন। কিন্তু তাহাদের এই উত্তরও অসার এবং অকেজো সাব্যস্ত হইল। কারণ যদি অপর কেহ ইমাম মাহ্দী হইতেন, তাহা হইলে হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী শতাব্দীর শিরোভাগে সেই ইমামের আবির্ভূত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শতাব্দীর পর ১৫ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের বাঞ্ছিত কোন ইমাম আবির্ভূত হইলেন না।

এই কথার পর তাহাদের শেষ জবাব হইল যে-তাহারা কাফির, তাহাদের বই পড়িও না,তাহাদের সহিত মেলামেশা করিও না এবং তাহাদের কথা শুনিও না, কারণ তাহাদের কথায় অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু কীরূপ পরিতাপের বিষয় যে, আকাশও তাহাদের বিরোধী হইয়া গিয়াছে এবং পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিও তাহাদের বিরোধিতা করিতেছে। ইহা তাহাদের জন্য কীরূপ লাঞ্ছনার বিষয় যে, একদিকে আকাশ তাহাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে এবং অপরদিকে ক্রুশের প্রাধান্যের জন্য পৃথিবীও তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

আকাশের সাক্ষীর কথা দারকুতনী ইত্যাদি পুস্তকে বর্ণিত আছে অর্থাৎ রমযান মাসে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ এবং পৃথিবীর সাক্ষ্য-ক্রুশের প্রাধান্য, যাহাদের প্রাধান্যের সময় প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন জরুরী ছিল। সহীহ্ বুখারীর হাদীস অনুযায়ী এই দুই সাক্ষ্য আমার সাহায্যকারী এবং তাহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী।

পুনরায়, লেখরামের মৃত্যুর যে নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও তাহাদিগকে কম লজ্জিত করে নাই।

একইভাবে 'মহাসম্মেলন' অর্থাৎ জাতিসমূহের ধর্মীয় জলসা যাহাতে আমার রচনা নিদর্শন-স্বরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, উহাও তাহাদের জন্য কম আক্ষেপের কারণ হয় নাই। কারণ উহাতে শুধু আমার রচনাই প্রাধান্য লাভ করে নাই বরং এ সংবাদ সময়ের পূর্বেই ইলহাম দ্বারা অবগত হইয়া

ইশতেহারের মাধ্যমে প্রচার করা হইয়াছিল।

হায়! যদি আথমই জীবিত থাকিত, তাহা হইলে মিঞাঁ মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী এবং তাহার সহযোগীদের হাতে মিথ্যা ব্যাখ্যা করিবার অবকাশ থাকিত, কিন্তু আথমও শীঘ্র মরিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া গিয়াছে। যতদিন সে নীরব ছিল, ততদিন সে জীবিত ছিল এবং যখনই সে মুখ খুলিল তখনই ইলহামের শর্ত তাহাকে করায়ত্ত করিল। খোদাতাআলা ইলহামের শর্ত অনুযায়ী তাহাকে আয়ু দান করিয়াছিলেন এবং যখনই সে মিথ্যা আরোপ করিতে আরম্ভ করিল তখন হইতেই কঠিন বিপদাবলী তাহাকে এমনভাবে গ্রেফতার করিল যে, শীঘ্র তাহার জীবনের অবসান ঘটাইয়া দিল। কিন্তু যেহেতু এই লাঞ্ছনাকে কতক অজ্ঞ মৌলভী বুঝিতে পারে নাই, তাই শর্ত-সাপেক্ষ ভবিষ্যদ্বাণীকে দুষ্টামির দৃষ্টিতে তাহারা এমনভাবে দেখিল যেন উহার সহিত কোন শর্তই সংযুক্ত ছিল না।

ভবিষ্যদ্বাণীর দিনগুলিতে আথমের সুস্পষ্ট ভীতি-বিহ্বল এবং নির্বাক অবস্থা হইতেও তাহারা ন্যায়পরায়ণতার সহিত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই এবং আথমকে যখন কসম খাইবার জন্য আহ্বান জানানো হইল এবং নালিশ করিবার জন্য তাহাকে প্ররোচিত করা হইল এবং সে কানে হাত দিয়া উহা অস্বীকার করিতে লাগিল, তখনও তাহারা এই সকল ঘটনা হইতে কোনই শিক্ষা গ্রহণ করিল না। এইজন্য খোদাতাআলা, যিনি নিজের নিদর্শনগুলিকে সন্দেহের মধ্যে রাখিতে চাহেন না, লেখরামের ভবিষ্যদ্বাণী- যাহার সহিত কোন শর্ত সংযুক্ত ছিল না এবং যাহার মধ্যে দিন তারিখ এবং মৃত্যু কীভাবে হইবে তাহাও বর্ণনা করা হইয়াছিল, তাহা বিরুদ্ধবাদীগণকে নিরুত্তর করিবার জন্য চূড়ান্ত সুস্পষ্টতার সহিত পূর্ণ করিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সত্যের বিরোধীগণ খোদাতাআলার এইরূপ প্রকাশ্য নিদর্শন হইতেও কোন উপকার লাভ করিল না। ইহা সুস্পষ্ট যে, আমি যদি মিথ্যাবাদী হইতাম, তাহা হইলে লেখরামের ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে আমাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য অতি উত্তম সুযোগ ছিল। কারণ উহার সহিত কোন শর্ত ছিল না। এবং ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত আমি আমার লিখিত স্বীকৃতি প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হইলে আমি মিথ্যাবাদী এবং আমি

সর্বপ্রকার শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগের যোগ্য হইব। সুতরাং আমি যদি মিথ্যাবাদী হইতাম, তবে এইরূপ অবস্থায় যখন শর্তহীন ভবিষ্যদ্বাণী কসম খাইয়া প্রকাশ করিয়া দিলাম তখন নিশ্চয়ই খোদাতাআলা আমাকে লাঞ্ছিত করিতেন এবং আমার ও আমার জামাতের নাম ও চিহ্নকে মিটাইয়া দিতেন। কিন্তু খোদা এরূপ করেন নাই বরং এই ব্যাপারে তিনি আমার সম্মান বাড়াইয়া দিলেন। যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞতার জন্য আথমের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য বুঝিতে পারে নাই, তাহাদের অন্তরেও তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা আলোকপাত করিলেন। ইহা কি ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নহে যে, এমন এক ভবিষ্যদ্বাণী যাহার মধ্যে কোন শর্ত ছিল না, এবং যাহা পূর্ণ না হইলে আমার ভরাডুবি হইত, খোদাতাআলা কেন উহাতে আমার সাহায্য করিলেন, এবং কেন তিনি ইহা পূর্ণ করিয়া শত শত হৃদয়ে আমার প্রতি ভালবাসা জন্মাইলেন! এমন কি অনেক ঘোর শত্রুও কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া আমার নিকট বয়াত করিল। যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হইত, তাহা হইলে মিঞাঁ বাটালবী সাহেব নিজেই চিন্তা করিয়া দেখুন যে, (আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিতে) তিনি তাহার পত্রিকা "ইশায়াতুস্‌সুন্নাহ্‌"তেও কীরূপ উদ্দীপনার সহিত মিথ্যা প্রতিপন্নমূলক লেখা প্রকাশ করিতেন এবং জনসাধারণের উপর উহার প্রতিক্রিয়া কীরূপ হইত? কেহ কি চিন্তা করিতে পারে যে, এরূপ ক্ষেত্রে খোদা কেন বাটালবী এবং তাহার সমভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে লজ্জিত এবং লাঞ্ছিত করিলেন? কুরআনে কি ইহা নাই "খোদা লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, তিনি বিশ্বাসীগণকে জয়যুক্ত করেন?" এই ভবিষ্যদ্বাণী, যাহাতে শর্তের কণামাত্রও ছিল না এবং যাহা এক বড় বিরুদ্ধবাদীর সম্বন্ধে করা হইয়াছিল, যে আমার প্রতি দন্তপেষণ করিত, যদি উহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইত, তাহা হইলে এই সুস্পষ্ট মীমাংসার পর আমার কি কোন অস্তিত্ব থাকিত? এবং ইহা কি সত্য নহে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে শেখ মুহাম্মদ হোসেন বাটালবী হাজার ঈদের আনন্দ লাভ করিতেন এবং তিনি রঙ-বেরঙের হাসি-তামাসাপূর্ণ রঙ-বেরঙের লেখা দিয়া তাহার পত্রিকা বাহির করিতেন এবং কত জলসা করিতেন! কিন্তু এক্ষণে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার পর তিনি কী করিয়াছেন? ইহা কি সত্য নহে যে, তিনি খোদার এক মহান নিদর্শনকে একটি অকেজো জিনিসের ন্যায় ফেলিয়া দিয়াছেন এবং নিজের ঘৃণ্য পত্রিকায় ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, এই ব্যক্তিই লেখরামের হত্যাকারী। সুতরাং আমি বলিতে চাহি যে,

বাহ্যিক অস্ত্র দ্বারা আমি কাহারও হত্যাকারী নই। অবশ্য আসমানী অর্থাৎ দোয়ার দ্বারা হত্যাকারী বটে, কিন্তু তাহাও তাহারই (লেখরাম) বারবার আবেদন ও নিবেদনের প্রেক্ষিতে। আমি তাহার জন্য বদ-দোয়া করিতে চাহি নাই, বরং সে নিজেই ইহা চাহিয়াছিল। সুতরাং যেভাবে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ইরানের বাদশাহ্ খসরু পারভেজের হত্যাকারী ছিলেন ঠিক সেইভাবে আমি তাহার হত্যাকারী।

বস্তুতঃ খোদাতাআলা লেখরামের ঘটনার দ্বারা মুহাম্মদ হোসেনের বাক্‌রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহার অপরাপর সমমান ভাইদেরও একই অবস্থা।

ইহার পর ডাঃ ক্লার্কের মোকদ্দমায় খোদার নিদর্শন প্রকাশিত হইল এবং চূড়ান্ত রায় বাহির হইবার পূর্বে, যে ভবিষ্যদ্বাণী শত শত লোকের মধ্যে প্রচার করা হইয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইল। এই মোকদ্দমায় শেখ বাটালবী এরূপ লাঞ্ছিত হইলেন যে, তাহার মধ্যে কিছুমাত্র সাধুতা থাকিলে, তিনি অবিলম্বে খাঁটি তওবা করিতেন। তাহার নিকট ইহা খুব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে যে, খোদা কাহাকে সাহায্য করিয়াছেন।

স্মরণ থাকে যে, ক্লার্কের মোকদ্দমায় মুহাম্মদ হোসেন খৃষ্টানগণের সহিত মিলিত হইয়া আমাকে ধ্বংস করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং আমাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য কোন পন্থাই বাকী রাখেন নাই। অবশেষে আমার খোদা আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করিয়া মুক্ত করিলেন এবং প্রকাশ্য আদালতে চেয়ার চাহিয়া তিনি এমন লাঞ্ছিত হইলেন যে, যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহাতে লজ্জায় মরিয়া যাইতেন। একজন সত্যবাদীকে লাঞ্ছিত করিবার ইহাই পরিণাম। তাহার চেয়ার চাওয়ার আবেদনে ডেপুটি কমিশনার বাহাদুর তাহাকে ধমক দিয়া বলেন, "না তুই কখনও চেয়ার পাইয়াছিস, না তোর বাপ।" এইভাবে ধমক দিয়া তাহাকে পিছু হটাইয়া দিয়া বলেন, "সোজা দাঁড়াইয়া থাক।"

ইহা তাহার জন্য 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা' সদৃশ। তাহাকে যখন এইভাবে ধমক দেওয়া হইতেছিল, তখন এই অধম ডেপুটি কমিশনার সাহেবের নিকটে চেয়ারে উপবিষ্ট ছিল, যাহার লাঞ্ছনা দেখিবার জন্য সে আসিয়াছিল।

এই ঘটনা বার বার উল্লেখ করিবার আমার কোন প্রয়োজন নাই। আদালতের অফিসার এবং আমলা বিদ্যমান আছেন, যাহার ইচ্ছা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

এখানে প্রশ্ন এই যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলার ওয়াদা আছে যে, তিনি বিশ্বাসীগণকে সাহায্য করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে মিথ্যাবাদী এবং দাজ্জাল-প্রতারকদের লাঞ্ছিত করেন। অবশেষে নদীর স্রোত উল্টা দিকে বহিতে লাগিল এবং ময়দানে মুহাম্মদ হোসেনই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে থাকিল। খোদাতাআলা কি আপন প্রিয়জনের সহিত এই ব্যবহারই করিয়া থাকেন?

এখন ট্যাক্সের মোকদ্দমায় শেখ বাটালবী সাহেব এইজন্য আনন্দিত ছিলেন যে, যেভাবেই হউক ট্যাক্স যেন ধার্য করা হয় যাহাতে এই বিষয়টিকে লম্বা চওড়া করিয়া তাহার ইশাআতে সুন্নাহ পত্রিকার শ্রী বৃদ্ধি করিতে পারেন যদ্বারা তাহার পূর্ব-লাঞ্ছনা কিছুটা ঢাকা পড়িয়া যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাতেও তিনি বিফল হইলেন এবং পরিষ্কারভাবে ট্যাক্স রেহাইয়ের আদেশ হইল। খোদাতাআলা এই মোকদ্দমা এমন এক বিচারকের হাতে ন্যস্ত করিলেন যিনি সততা ও ঈমানদারীর সহিত বিচারকার্যকে সম্পন্ন করিলেন। সুতরাং বিদ্বেষপরায়ণ ও হতভাগ্যরা এই আক্রমণেও বঞ্চিত হইল।

খোদাতাআলার হাজার হাজার শোকর যে, তিনি ন্যায়-বিচারক হাকিমের নিকট প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এই স্থলে গুরদাসপুর জেলার ডেপুটি কমিশনার মিঃ টি, ডিকশন বাহাদুরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমাদের উচিত, যাঁহার অন্তরে খোদাতাআলা বাস্তব সত্যকে উদঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। এইজন্যই আমি প্রথম হইতেই ইংরাজের শাসন এবং ইংরাজ শাসকগণের নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাহাদের প্রশংসা করি। কারণ তাহারা সকল অবস্থায় বিচারকে প্রাধান্য দেন।

ডঃ ক্লার্কের ফৌজদারী মোকদ্দমায় কমিশনার ক্যাপ্টেন ডগলাস সাহেব এবং এই ইনকাম ট্যাক্সের মোকদ্দমায় মিঃ টি, ডিকশন সাহেব, ইংরাজী ন্যায়-বিচার এবং সত্য-প্রিয়তার এমন দুই নমুনা দেখান, যাহা আমি আজীবন ভুলিতে পারিব না। কারণ ক্যাপ্টেন ডগলাস সাহেবের সমক্ষে এমন

এক জটিল মোকদ্দমা আসিয়াছিল, যাহাতে ফরিয়াদী একজন বিশিষ্ট খৃষ্টান ছিলেন এবং সম্ভবতঃ পাঞ্জাবের সমস্ত পাদ্রী তাহার সাহায্যকারী ছিলেন। কিন্তু কাহারা এই মোকদ্দমা দায়ের করিল সেদিকে উক্ত বিচারক কোনই ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। তিনি পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচার কার্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং আমাকে মুক্তি দিয়াছেন। ইদানিং যে মোকদ্দমা মিঃ টি, ডিকশন সাহেবের বিচারাধীন ছিল, উহাও সংকটজনক ছিল। কারণ, ইনকামট্যাক্স রেহাই দিলে সরকারের ক্ষতি হয়। তথাপি তিনি পূর্ণ নিরপেক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সুবিচারের সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। আমার বিবেচনায় এই সকল বিচারক গভর্ণমেন্টের প্রজাপালন, সদিচ্ছা এবং বিচারের নীতি পালনে উজ্জ্বল নমুনাস্বরূপ। বস্তুতঃ সঠিক ঘটনাটি ইহাই ছিল যাহা মিঃ টি, ডিকশন সাহেবের উজ্জ্বল মস্তিষ্ক আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছিল। সেজন্য আমি তাহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাহার জন্য দোয়াও করিতেছি।

এখানে বাটালা পরগণার তহসীলদার মুন্সী তাজউদ্দিন সাহেবের পরিশ্রম এবং তদন্তকার্য উল্লেখযোগ্য। তিনি ন্যায়পরায়ণতা এবং সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া আসল ঘটনা আয়নার মত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। এইভাবে তিনি আসল ঘটনার সত্যতা উদ্‌ঘাটন করিতে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এখন সেই মোকদ্দমা অর্থাৎ তহসীলদার সাহেবের মতামত এবং ডেপুটি কমিশনার বাহাদুরের রায় নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

ডেপুটি কমিশনার বাহাদুর টি, ডিকশন সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে ইনকামট্যাক্সের মোকদ্দমার নথিতে আপত্তি সম্বন্ধে গুরদাসপুর জেলার অন্তর্গত বাটালা পরগণার তহসীলদার মুন্সী তাজউদ্দিন সাহেবের রিপোর্টের নকল ঃ

মোকদ্দমা রুজুর তারিখ ১৮৯৮ সালের ২৭শে জুন।

ফয়সালা- ৯৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর। মোকদ্দমা নং ৫৫/৪৬।

ইনকামট্যাক্স মোকদ্দমার আপত্তির নথি-মির্যা গোলাম আহ্‌মদ, পিতা মির্যা গোলাম মুরতযা, জাতি মোগল, সাং কাদিয়ান, তহসীল বাটালা, জিলা

গুরদাসপুর।

মহামহীম জনাব ডেপুটি কমিশনার বাহাদুর, জেলা গুরদাসপুর।

জনাবে আলি! কাদিয়ান নিবাসী মির্যা গোলাম আহ্মদের উপর এ বৎসর মং ১৮৭.৫০ টাকা ইনকামট্যাক্স ধার্য হইয়াছিল। ইহার পূর্বে কখনও মির্যা গোলাম আহমদ- এর উপর ট্যাক্স ধার্য হয় নাই। যেহেতু এই ট্যাক্স নূতন ধার্য করা হইয়াছিল, সেইজন্য মির্যা গোলাম আহ্মদ হুযুরের আদালতে আপত্তি জানাইয়াছিলেন। উহার তদন্তের ভার আমার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। ইনকামট্যাক্স সম্বন্ধে যতদূর তদন্ত করা হইয়াছে, উহা বর্ণনা করিবার পূর্বে গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানীর সম্বন্ধে হুযুরের খেদমতে কিছু বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি, যেন হুযুর জানিতে পারেন যে, আপত্তিকারী কে এবং তাঁহার মর্যাদা কী।

মির্যা গোলাম আহ্মদ প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মোগল বংশোদ্ভুত, যাহারা দীর্ঘকাল হইতে কাদিয়ান মৌজায় বসবাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার পিতা মির্যা গোলাম মুরতযা এক সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। তিনি কাদিয়ান মৌজার প্রধান ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া যান। অবশ্য ইহার মধ্যে কিছু সম্পত্তি মির্যা গোলাম আহ্মদ এর নিকট এখনও আছে এবং কিছু তাহার পুত্র মির্যা সুলতান আহ্মদের কাছে আছে যাহা তিনি মির্যা গোলাম কাদের মরহুমের স্ত্রীর মাধ্যমে পাইয়াছেন। এই সম্পত্তির অধিকাংশই চাষোপযোগী, যথা, বাগান, ক্ষেত ও কতকগুলি তালুকদারী গ্রাম আছে। যেহেতু মির্যা গোলাম মুরতযা সম্ভ্রান্ত রইস ছিলেন, আমার মনে হয় সম্ভবতঃ তিনি অনেক নগদ টাকা এবং অলংকারাদি রাখিয়া যান। কিন্তু এইরূপ অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন সাক্ষী পাওয়া যায় নাই।

মির্যা গোলাম আহ্মদ প্রথম জীবনে স্বয়ং চাকুরী করিতেন এবং তাঁহার চাল-চলন সর্বদাই এইরূপ ছিল যে, তিনি তাঁহার নিজ আয় অথবা পিতার সম্পত্তি, নগদ টাকা ও অলংকারাদি অপচয় করিতে পারেন বলিয়া আশা করা যায় না। পিতা হইতে ওয়ারিসসূত্রে যে সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যাহাই হউক না কেন, মির্যা গোলাম আহ্মদ-

এর স্বভাবদৃষ্টে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তিনি তাহা সার্বিক আত্মসাৎ করেন নাই।

কিছুদিন হয় মির্যা গোলাম আহ্‌মদ চাকুরী ইত্যাদি ছাড়িয়া দিয়া নিজ ধর্মের প্রতি মনোযোগী হন এবং ধর্মীয় নেতা হইবার চেষ্টা করেন। তিনি কয়েকখানা পুস্তক প্রকাশ করেন, সাময়িকী ও পুস্তিকা রচনা করেন এবং আপন মত ও চিন্তাধারা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করেন। সুতরাং তাঁহার এই কার্যকলাপের ফলে অল্প কালের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের একটি দল, যাহাদের একটি তালিকা (ইংরাজি বর্ণমালানুসারে) এতদ্‌সঙ্গে দেওয়া হইল, তাঁহাকে নিজেদের নেতারূপে মানিয়া নেন এবং তাহারা একটি পৃথক ফেরকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই দলের সংশ্লিষ্ট লিষ্টে ৩১৮ ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত আছে যাহাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে কয়েক ব্যক্তি আছেন যাহারা সংখ্যায় অতি অল্প হইলেও বিশেষ সম্মানিত ও শিক্ষিত।

মির্যা গোলাম আহ্‌মদ- এর দলটি কিছু প্রসার লাভ করিলে, তিনি 'ফত্‌হে ইসলাম' ও 'তৌযীহে মরাম' পুস্তকদ্বয়ের মাধ্যমে নিজ উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য তাঁহার অনুবর্তীদের নিকট চাঁদার আবেদন জানান এবং যে সমস্ত কাজের জন্য চাঁদার প্রয়োজন, উহার পাঁচটির নাম উল্লেখ করেন। যেহেতু মির্যা গোলাম আহ্‌মদ-এর প্রতি তাঁহার শিষ্যদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সুতরাং তাহারা ক্রমান্বয়ে চাঁদা পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন কোন সময়ে তাহারা আপন পত্রাদিতে উল্লেখ করিয়া দেন যে, উহার চাঁদা উক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে অমুক বিষয়ে ব্যয় করিতে হইবে। আবার কখনও তাহারা মির্যা গোলাম আহ্‌মদ এর ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেন যেন তিনি যে বিষয়ে প্রয়োজন মনে করেন, ব্যয় করেন। সুতরাং বাদী মির্যা গোলাম আহ্‌মদ-এর বর্ণনা মতে এবং সাক্ষী প্রমাণ দৃষ্টে চাঁদার টাকার ব্যবস্থা উপরোক্তরূপে হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ এই দল বর্তমানে একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রূপে বিরাজিত এবং ইহার নেতা হইতেছেন মির্যা গোলাম আহ্‌মদ, অপর সকলে তাহার অনুবর্তী। তাহাদের নিজেদের চাঁদা দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে। যে পাঁচটি বিষয়ের কথা উপরে বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নরূপঃ

১ম- মেহমানখানাঃ ধর্মসংক্রান্ত বিষয় জানিবার জন্য যে সমস্ত লোক কাদিয়ানে মির্যা গোলাম আহ্‌মদ এর নিকট আগমন করিয়া থাকেন, তাহারা মুরীদ হউন বা না হউন কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে অনুসন্ধানে আসেন, তাহাদিগকে ঐখান হইতে খাবার দেওয়া হয় এবং মির্যা গোলাম আহ্‌মদ- এর মোক্তারের দ্বারা লিখিত বর্ণনামতে এই চাঁদা হইতে পর্যটক, এতীম এবং বিধবাদিগকে সাহায্য দেওয়া হয়।

২য়- ছাপাখানাঃ ইহাতে ধর্মীয় পুস্তক এবং বিজ্ঞাপনাদি মুদ্রণ করা হয় এবং কোন কোন সময়ে লোকদিগকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

৩য়- মাদ্রাসাঃ মির্যা গোলাম আহ্‌মদ-এর শিষ্যদের দ্বারা একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু ইহার এখন প্রারম্ভিক অবস্থা। ইহা মির্যা গোলাম আহ্‌মদের একজন বিশেষ শিষ্য মৌলভী নূরউদ্দিন সাহেবের পরিচালনাধীন রহিয়াছে।

৪র্থ- বার্ষিক এবং অন্যান্য সম্মেলনঃ এই সম্প্রদায়ের বার্ষিক সম্মেলনও হইয়া থাকে এবং ইহার খরচপত্রাদির জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়।

৫ম- চিঠি-পত্রাদিঃ মির্যা গোলাম আহ্‌মদ- এর মোক্তারের লিখিত বর্ণনা ও সাক্ষীগণের সাক্ষ্য অনুযায়ী এই বিষয়ে বহু টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। ধর্ম-সংক্রান্ত তথ্যাদির জন্য যে সমস্ত চিঠি-পত্রাদি লিখা হইয়া থাকে, উহার জন্য শিষ্যদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করা হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ সাক্ষীগণের সাক্ষ্যমতে এই পাঁচটি বিষয়ের জন্য চাঁদার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে এবং এই সকল উপায়ে মির্যা গোলাম আহ্‌মদ এবং তাঁহার শিষ্যগণ নিজেদের ধর্মীয় মতামত প্রচার করিয়া থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানটি একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়, যেহেতু পূর্ব হইতেই হুযুর এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে অবগত আছেন, তাই বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করা হইল। এখন আপত্তির মূল বক্তব্য সম্বন্ধে নিবেদন করা যাইতেছেঃ

এ বৎসর গোলাম আহ্‌মদ - **এর ৭২০০'০০ টাকা বার্ষিক আয়** সাব্যস্ত করিয়া মং ১৮৭ টাকা ৮ আনা আয়কর ধার্য করা হইয়াছে। এই অধম যখন কাদিয়ানে গমন করিয়াছিল, তখন তাঁহার আপত্তি অনুসারে উহার

নিজের জবানবন্দী গ্রহণ এবং তেরজন সাক্ষীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করাইয়াছেন যে, তাঁহার তালুকাদারী, জমি এবং বাগানের আয় আছে। তালুকদারীর বার্ষিক আয়- ৮২টাকা ১০ আনা, জমি হইতে বার্ষিক তিনশত টাকা। এবং বাগানের বার্ষিক আয় আনুমানিক দুই-তিনশত, চারিশত, অথবা সর্বাধিক পাঁচশত টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আর কোন প্রকার আয় নাই।

মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইহাও বর্ণনা দিয়াছেন যে, তাঁহার কাছে মুরীদের নিকট হইতে এ বৎসর আনুমানিক পাঁচ হাজার দুইশত টাকা আসিয়াছে। নতুবা গড়ে বার্ষিক চারি হাজার টাকা আয় তো হইয়া থাকে এবং ঐ টাকা উপরে বর্ণিত পাঁচটি খাতে ব্যয় করা হয়, তাঁহার ব্যক্তিগত কাজে খরচ হয় না। আন্দাজ করিয়া একটি হিসাব লিখানো হইয়াছে।

মির্যা গোলাম আহ্‌মদ আরও বর্ণনা দিয়েছেন যে, বাগান, জমি এবং তালুক হইতে তাঁহার ব্যক্তিগত আয় তাঁহার খরচের জন্য যথেষ্ট। নিজের খরচের জন্য শিষ্যগণের টাকার তাঁহার কোন প্রয়োজন হয় না। মির্যা গোলাম আহ্‌মদ- এর বর্ণনা সাক্ষীগণের সাক্ষ্য সমর্থন করে। আরও বর্ণনা করা যাইতেছে যে, মুরীদগণ দান হিসাবে উপরোক্ত পাঁচটি খাতে টাকা পাঠাইয়া থাকে এবং তাহা ঐ সমস্ত কাজেই ব্যয় হইয়া থাকে। তালুকদারী, জমি ও বাগানের ব্যক্তিগত আয় ছাড়া মির্যা গোলাম আহ্‌মদ- এর আর কোন আয় নাই যাহার উপর ট্যাক্স ধার্য করা যাইতে পারে।

সাক্ষীগণের মধ্যে ছয়জন অতিশয় বিশ্বাসী। কিন্তু তাহারা সকলেই মির্যা গোলাম আহ্‌মদ- এর মুরীদ এবং প্রায় সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকেন। বাকী সাতজন বিভিন্ন শ্রেণীর দোকানদার এবং মির্যা সাহেবের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। সাধারণভাবে সমস্ত সাক্ষী মির্যা গোলাম আহ্‌মদ -এর বর্ণনাকে সমর্থন করেন এবং তালুকদারী, জমি ও বাগান ব্যতীত তাঁহার আর কোন ব্যক্তিগত আয়ের কথা বলেন না। এই তদন্ত উপলক্ষ্যে আমি মির্যা গোলাম আহ্‌মদ - এর ব্যক্তিগত আয় সম্বন্ধে জানিবার জন্য গোপনে কোন কোন লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি। যদিও কোন কোন ব্যক্তি বলিয়াছে যে,মির্যা গোলাম আহ্‌মদ-এর ব্যক্তিগত আয় অনেক বেশী এবং উহা ট্যাক্সের যোগ্য, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোথাও কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া

যায় নাই। মৌখিক আলোচনা শুনা গিয়াছে, কিন্তু কেহ কোন প্রমাণ দিতে পারে নাই।

আমি কাদিয়ান মৌজায়, মাদ্রাসা এবং মেহমানখানা পরিদর্শন করিয়াছি। মাদ্রাসা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে এবং অধিকাংশ বাড়ী কাঁচা তৈয়ারী করা হইয়াছে। শিষ্যদের জন্যও কয়েকখানা ঘর তৈয়ার করা হইয়াছে, কিন্তু মেহমানখানায় বাস্তবিকই মেহমান দেখিতে পাওয়া গেল। ইহাও দেখা গেল যে, ঐ দিন যে সমস্ত শিষ্য কাদিয়ানে উপস্থিত ছিলেন, তাহারা সকলেই মেহমানখানায় খাবার খাইয়াছেন।

সাক্ষীদের প্রমাণ সাপেক্ষে অধীনের ক্ষুদ্র অভিমত এই যে, তালুকদারী ও বাগানের আয়কে মির্যা গোলাম আহ্‌মদ- এর ব্যক্তিগত আয় রূপে গণ্য করা হউক এবং মুরীদগণের নিকট হইতে মির্যা সাহেবের যে আয় হয়, তাহা দান হিসাবে গণ্য করা হউক। সাধারণভাবে সাক্ষীগণ যাহা বলিয়াছেন তাহাতে মির্যা গোলাম আহ্‌মদ এর উপর বর্তমান ধার্যকৃত কোন ট্যাক্স বহাল থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন অপর দিক চিন্তা করা যায় যে, মির্যা গোলাম আহ্‌মদ এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁহার পূর্বপুরুষগণও বিত্তশালী ছিলেন ও তাঁহাদের আয়ও যথেষ্ট ছিল এবং মির্যা গোলাম আহ্‌মদ নিজেও চাকুরী করিতেন ও সুখ-শান্তিতে ছিলেন, তখন ধারণা হয় যে, মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব একজন ধনী ব্যক্তি এবং আয়কর দিবার উপযুক্ত। মির্যা সাহেবের নিজ জবানবন্দীতে দেখা যায় যে, তিনি ইতোমধ্যে নিজের বাগান নিজ স্ত্রীর নিকট দায়বদ্ধ রাখিয়া তাঁহার নিকট হইতে চারি হাজার টাকার অলঙ্কার ও নগদ এক হাজার টাকা লইয়াছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির স্ত্রী এত টাকা দিতে পারেন, তাঁহার সম্বন্ধে এই ধারণা জন্মিতে পারে যে, তিনি একজন ধনী ব্যক্তি।

অধম কর্তৃক তদন্তের কাগজ পত্র সংযুক্ত করিয়া হুযুরের আদেশ পালনে এই রিপোর্ট হুযূরের খেদমতে প্রেরণ করা হইল।

বিনীত নিবেদক
তাজ উদ্দিন
তহ্‌সীলদার, বাটালা।

তারিখ ৩১শে আগষ্ট,১৮৯৮ ইং

পুনঃ ভারপ্রাপ্ত উকিলকে জানানো যায় যে, ১৮৯৮ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে মির্যা গোলাম আহ্‌মদকে আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য দিন ধার্য করা গেল।

হাকিমের তারিখযুক্ত স্বাক্ষর

ট্যাক্সের আপত্তির মধ্যবর্তী আদেশের নকল।
আয়কর ট্যাক্সের আপত্তির নথি।

এজলাস টি, ডিকশন, ডেপুটি কমিশনার, গুরদাসপুর
মির্যা গোলাম আহ্‌মদ, পিতা-মির্যা গোলাম মুরতযা
জাতি-মুঘল, সাকিন- মৌজা কাদিয়ান, থানা- বাটালা,
জিলা- গুরদাসপুর, পক্ষ হইতে-

অদ্য নথি-পত্র পেশ হইয়া তহ্‌সীলদার সাহেবের রিপোর্টের শুনানী হয়। উপস্থিত বিষয়টি বিবেচনাধীন থাকিবে।

উকিল শেখ আলি আহ্‌মদ এবং আপত্তিকারীর মোখতার উপস্থিত আছেন। তাহাদিগকে জানানো হইয়াছে।

তারিখ ০৩-০৯-৯৮

হাকিমের দস্তখত

চূড়ান্ত রায়ের অনুবাদের নকল আপত্তি আয়কর বিভাগ আদালত মিস্টার টি, ডিকশন ডেপুটি কমিশনার, গুরদাসপুর

চূড়ান্ত রায়ের অনুবাদ

এই ট্যাক্স নূতন ধার্য করা হইয়াছে। মির্যা গোলাম আহ্‌মদ দাবী করেন যে, তাঁহার সমস্ত আয় তাঁহার ব্যক্তিগত কাজে নহে বরং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁহার আরও সম্পত্তি আছে, কিন্তু তহসীলদারের নিকট জবানবন্দীতে তিনি বলিয়াছেন- জমি এবং কৃষিকার্য হইতে অর্জিত আয়, যাহা ৫ (বি) ধারামতে ট্যাক্স রহিতযোগ্য-উহাও ধর্মীয় কাজে ব্যয় করা হয়। আমি এই ব্যক্তির, যাহার সম্প্রদায় সুপরিচিত, তাঁহার সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। চাঁদা হইতে অর্জিত আয়, যাহা তাহার বর্ণনা মতে পাঁচ হাজার দুইশত টাকা এবং যাহা শুধু ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত হয়, ৫ (ই) ধারা মতে রেয়াত করিয়া দিলাম।

অতএব আদেশ দেওয়া গেল যে, আইন অনুমোদিত কার্যসমূহ শেষ করতঃ এই সমস্ত কাগজ-পত্র অফিসে জমা করিয়া দেওয়া হউক।

হাকিমের দস্তখত
তাং ১৭-৯-৯৮
ডালহৌজি

এ স্থলে আমি ইংরাজি চূড়ান্ত রায়ের নকল অনুবাদসহ তুলে ধরছি ঃ

In the Court of F.T. Dixon Esquire Collector of the District of Gurdaspur.

Income Tax objection case No. 46 of 1898.

Mirza Ghulam Ahmad son of Mirza Ghulam Murtaza, caste Mughal, resident of mauzah Qadian Mughlan, Tahsil Batala, Distt. of Gurdaspur objector

ORDER

This tax is a newly imposed one and Mirza Ghulam Ahmad claims that all his income is applied not to his personal but to the expenses of sect he has founded. He admits that he has other property but he stated to the Tahsildar that even the proceeds of that which is classed as land and the proceeds of agriculture and is exempt under 5 (b) go to his religious expenses. I see no reason to doubt the bona fides of this man, whose sect is well known, and I exempt his income from subscriptions which he states as 5200/- Under Sec 5 (c) as being solely employed in religious purposes.

Sd/T. Dixon

17-9-1898 Collector

আদেশ

এফ, টি, ডিকশন বাহাদুর, কালেক্টরের আদালত, জিলা-গুরদাসপুর
আয়কর আপত্তি মোকদ্দমা নং ৪৬-১৮৯৮

মির্যা গোলাম আহ্‌মদ, পিতা মির্যা গোলাম মুরতযা, জাতি-মুঘল, সাং-মৌজা- কাদিয়ান, থানা বাটালা, জিলা-গুরদাসপুর।

এই ট্যাক্স এইবারই ধার্য করা হইয়াছে। মির্যা গোলাম আহ্‌মদ বর্ণনা করেন যে, তাঁহার সমস্ত আয় তাঁহার ব্যক্তিগত কাজে নহে বরং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁহার আরও সম্পত্তি আছে, কিন্তু তহসীলদারের নিকট জবানবন্দীতে তিনি বলিয়াছেন- জমি এবং কৃষিকার্য হইতে অর্জিত আয়, যাহা ৫ (বি) ধারামতে ট্যাক্স রহিতযোগ্য-উহাও ধর্মীয় কাজে ব্যয় করা হয়। আমি এই ব্যক্তির, যাহার সম্প্রদায় সুপরিচিত, তাঁহার সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। চাঁদা হইতে অর্জিত আয়, যাহা তাহার বর্ণনা মতে পাঁচ হাজার দুইশত টাকা এবং যাহা শুধু ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত হয়, ৫ (ই) ধারা মতে রেয়াত করিয়া দিলাম।

দস্তখত টি, ডিকশন
কালেক্টর

তাং ১৭-৯-৯৮

নোট ঃ যে পুস্তকের উপর লেখকের দস্তখত এবং মোহর না থাকিবে তা চুরিকৃত সাব্যস্ত হইবে।

লেখক- মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
তারিখ- ২০ অক্টোবর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ